লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২১ জামা: সানি, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১৬ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর ১৩তম শান্তি সম্মেলন সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

বিস্তারিত পড়ুন ৪৬ পৃষ্ঠায়

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১১তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত আগামী ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী, বোর্ড গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবরে পৌঁছাতে হবে। আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার থেকে ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারীদেরকে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে। (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেক-আপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে। (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এবং নিজ বাড়ি অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে (ছ) আবেদন পত্রে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারীকে ভাল ভাবে চিনেন ও জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তিটি সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। প্রয়োজনে যেসব মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অফ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ

১৪২৩ বঙ্গাব্দের শুভ আগমনের অপেক্ষায় আমরা। আমাদের পাঠক, লেখকবৃন্দ এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আগাম অভিনন্দন। নববর্ষের আনন্দ ধারায় সকলেই হয় পুলকিত। তবে বৈশাখের রৌদ্রকরজ্জ্বল তাপদাহে তপ্ত ধরণী যেমন সঞ্চিত তাপ শক্তি ধারণ করে পরবর্তীতে বর্ষার বারিধারায় হয়ে উঠে সুজলা-সুফলা, তেমনি ধর্ম জগতে নিষ্ফলা এক কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঘটে গেছে এক মহা বিপ্লব। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তাঁর (আ.) পরলোক গমনের পর মহান আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় **'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত'**-এর ধারায় আহমদীয়া খিলাফত। আজ এই খিলাফতের পঞ্চম খলীফা সারা বিশ্বের কোটি কোটি পথহারা মানুষকে আলোর সন্ধান দিচ্ছেন। সারা বিশ্বের প্রকৃত আনন্দ তখনই প্রকাশ পাবে যখন সবাই এই ঐশী খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে আর খুঁজে পাবে বিশ্বজনীন শান্তির পথ।

যুগ যুগ ধরে এদেশের চাষী মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি-জেলে নববর্ষ বরণ করে আসছে প্রাণবন্ত উৎসবের আমেজে। বৈশাখ আসে বাঙ্গালী জীবনে নতুন শস্যের আবাহন নিয়ে। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে গ্রাম গঞ্জে মেলা বসে নানা পসরা সাজিয়ে, ঘোড়দৌড়ও হয়। সেই প্রাণ প্রবাহ আজ ম্রিয়মান হলেও পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসেবেই পরিণত হয়ে আছে।

আগত নববর্ষ দূর হোক পুরনো বছরের যত গ্লানি আর সব দুঃখ-কষ্ট বিদূরীত হয়ে বয়ে আনুক আমাদের সবার জন্য সুখ শান্তি ও স্বস্তিভরা দিন।

মোঘল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা নববর্ষ প্রবর্তন করেছিলেন। ঋতু পরিক্রমায় বৈশাখকে শস্য রোপনের মাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈশাখে খরতপ্ত মাঠ নবধারা জলে সিঞ্চিত হলে কৃষক জমিতে হালকর্ষণ করে বীজ বোনে, আশায় বুক বাঁধে সোনালী ফসলের। পহেলা বৈশাখে দোকানীরা পুরনো বছরের হিসাব চুকিয়ে হালনাগাদ করে নেয় তার হিসাব, খুলে নেয় নব বর্ষের খাতা, তাই এদিনে ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' আনুষ্ঠানিক জাঁকজমকের সাথে করে।

যুগ যুগ ধরে এদেশের চাষী মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি-জেলে নববর্ষ বরণ করে আসছে প্রাণবন্ত উৎসবের আমেজে। বৈশাখ আসে বাঙ্গালী জীবনে নতুন শস্যের আবাহন নিয়ে। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে গ্রাম গঞ্জে মেলা বসে নানা পসরা সাজিয়ে, ঘোড়দৌড়ও হয়। সেই প্রাণ প্রবাহ আজ ম্রিয়মান হলেও পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসেবেই পরিণত হয়ে আছে।

দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক আর সমগ্র জাতি অর্জন করুক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, নববর্ষ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ আর দূর হোক সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি, সবাই ফিরে পাক প্রকৃত সুখের নীড়। জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে পরাস্ত করে বাঙ্গালী ঐতিহ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হোক সবার মাঝে, এটাই আমাদের কামনা।

Love For All — Hatred For None

সবার তরে ভালোবাসা — ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

আবারও সকলকে আগত নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা–
শুভ নববর্ষ ১৪২৩

সূচিপত্র

৩১ মার্চ, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর ডেস্ক থেকে ৬

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৮

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১১ই মার্চ, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১১

বয়আতের শর্তসমূহ এবং
একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২২ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২০

কলমের জিহাদ ২৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

খলীফাগণের তাহরীক শতভাগ আমল করার মধ্যেই
সকল কল্যাণ নিহিত ২৯
মওলানা জাফর আহমদ

এ নৃশংসতার শেষ কোথায়
মানুষের মূল্যবোধ কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৩২
মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র কুরআন ও দোয়া ৩৪
মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৬
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

নবীনদের পাতা
প্রত্যহ কুরআন পাঠের গুরুত্ব ৩৭
মেনহাজ করিম (আশা)

পাপ মানুষের আত্মাকে রুগ্ন করে দেয় ৩৯
আবু সালেহ্ আহমদ

সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান, শাহেদ-২০১৫ ও
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ৪১

সংবাদ ৪৩

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর
বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। (এ প্রতিদান তাদের জন্য) যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। আর আমরা তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরই (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। অতএব তোমাদের জানা না থাকলে ঐশী গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞেস কর।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। আমরা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও ঐশী গ্রন্থাবলীসহ (তাদের প্রেরণ করেছিলাম)। আর তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দেয়ার জন্য আমরা তোমার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি এবং তারা যেন চিন্তাভাবনা করে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। যারা (তোমার বিরুদ্ধে) হীন ষড়যন্ত্র করে আসছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ ভূমিধ্বসে তাদের বিলীন করে দিবেন না বা তাদের কাছে এমন পথে আযাব আসবে না যা তারা অনুমানও করতে পারবে না,

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। বা তাদের চলাফেরার[১৫৪৮] সময় তিনি তাদের ধরে ফেলবেন না? অতএব তারা (আল্লাহ্‌কে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৫৪৮। অবিশ্বাসীদের পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ এবং ভূপৃষ্ঠের অবাধ চলাফেরা মু'মিনদের মনে যেন এই ধারণার সৃষ্টি না করে যে কাফিরদের এহেন প্রতাপ অজেয় এবং তাদের এই গৌরব চিরস্থায়ী। তাদের এই অবাধ গতিবিধি শীঘ্রই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধ্বংসকারীতে পরিণত হবে।

হাদীস শরীফ

নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করলে আল্লাহ্‌ও পরিবর্তন করেন না

জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে যদি চেষ্টা না করে বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– এর ফলে সে ক্ষতিই বয়ে আনে।

কুরআনঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে (সূরা রা'দ ঃ ১২)

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বলা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বলা ইযা ক্বলার রসূলু হালাকান্‌নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

মানুষের মাঝে উন্নতি লাভের জন্যে সব কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার অহমিকায় ভুগে, আবার কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে যদি চেষ্টা না করে বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে, তারা নিরুৎসাহিত হয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় ফিরে আসলো। 'ইসলামে পলায়ন করা হারাম আর আমরা পলায়ন করেছি' এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতো না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লো, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, "তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো"।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে যারা পরিহার করে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার রীতি হলো, তিনি তাদের হৃদয়কে সত্যে পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে-সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধারা সঞ্চালন করেন। তিনি তাদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেন এবং তাঁদের মাঝে পবিত্র প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন ঘটান আর পরিণতি উপলব্ধি করার ও ধ্বংসস্থল সম্পর্কে সাবধান থাকার জ্ঞান দান করেন। সকল কল্যাণ তাদের দিকে প্রবাহিত করেন আর সকল অকল্যাণ হতে তাঁদের দূরে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে কুরআনের তত্ত্ব ও নবী (সা.)-এর সুন্নতের জ্ঞান দান করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের লালন-পালন করেন ও নিজ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে ভূষিত করেন, একই সাথে এমন সকল বিষয় ও স্থান যা স্খলণের কারণ হতে পারে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁদেরকে ইসলামের (সীমানা ও শিক্ষার) রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেন যা সকল কল্যাণের উৎসস্থল। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ কল্যাণের অফুরন্ত সঞ্জীবনী ধারা প্রতিনিয়ত তাদের দিকে প্রবাহিত হয় আর এই ঐশী প্রস্রবণের কল্যাণে তাঁদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতি বা আলোর ফুৎকার করা হয়। মানুষ চেষ্টা করে পুণ্যকর্ম করে আর তাঁরা করেন সহজাত প্রেরণায়।

তাঁদের হাতে পুণ্যকর্ম তাঁদের সুস্থপ্রকৃতির তাড়নায় সাধিত হয়, কৃত্রিমভাবে নয়। যেভাবে ঝর্ণা প্রবল বেগে প্রবহমান থাকে এঁদের মাঝে প্রকৃতিগত সাধুতা সেভাবে বিরাজ করে। কঠিন কাজ সম্পাদনে অন্যদের যেমন কষ্ট হয় তাঁদের তা হয় না। ভয়ের মুহূর্তে তুমি তাঁদেরকে পর্বতের মত অবিচল দেখতে পাবে এবং চরম বিপদের সময় তাঁদের বীরত্ব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁরা চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত হন এবং চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অপারগতায় নয় বরং ভালোবাসার প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন।

বিপদের ভয়াবহতার ভয়ে নয় বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা প্রাণ উজাড় করে দেন। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। তুমি তাঁদের মধ্যে নোংরা স্বভাব ও মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করার অভ্যাস দেখবে না। তাঁরা (অর্থাৎ ওলীগণ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্র আর এতিম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। তাঁরা পঙ্কিলতা, কুটিলতা এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা অলৌকিক ও ঈমানী ঐশী নূরের জ্যোতিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়-আঙ্গিনা এমন আধ্যাত্মিক প্রাণীকূলের বিচরণস্থল যারা অন্যদের কাছে ভয়ে ধরা দেয় না। তাঁরা খোদার দ্বারে সেজদাবনত অবস্থায় থাকেন। তাঁদের আত্মা তাঁর ভালোবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিহার করেন। প্রবৃত্তি ও এর তাড়না কাকে বলে তা তাঁরা জানেন না। খোদা তা'লা নিজ প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান তাঁদের পরিচালিত করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার ফলে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন। তারপর করুণাবশত তাঁদেরকে নিজ বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, সাধুতা, পুণ্য ও সাফল্যের প্রতি আহবান করেন।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ০২-০৩ থেকে উদ্ধৃত]

ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর ডেস্ক থেকে

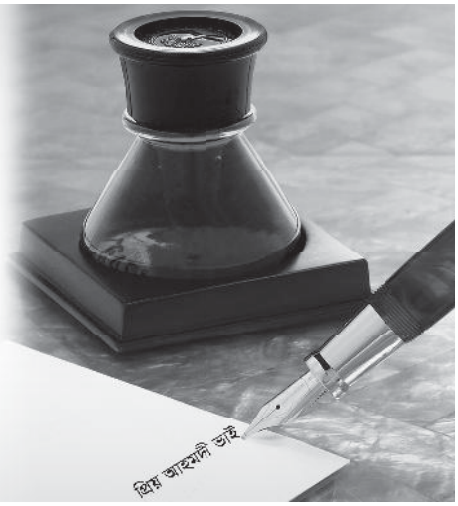

প্রিয় আহমদী ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

২৩ শে মার্চ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

২৩ শে মার্চ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করছি। প্রথমে মনে রাখতে হবে এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস নয়। ইসলামে জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করার কোন সুন্নত আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে পাইনি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হিসেবে বয়আত গ্রহণের নির্দেশ পাওয়ার পরে ২৩ শে ১৮৮৯ মার্চ তারিখে বয়আত গ্রহণ শুরু করার ঘোষণা দেন এবং আগে থেকে যারা তার কাছে বয়আত নেওয়ার আগ্রহ করেছিল তাদেরকে সংবাদ পাঠান। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে এই দিনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বিধায়, এই দিনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আশা করি সকল জামাতই এই দিনটি গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

এই সংক্রান্ত রিপোর্ট সকল জামাত থেকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা তা মরকযে জানাতে পারবো এবং আহমদী পত্রিকায় সংবাদ হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

তবলীগি কার্যক্রম

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে জামাতের তবলীগি কার্যক্রমে ধীরে ধীরে গতিশীলতা আসছে। যদিও বেশ কিছু জামাত এখনও তাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন না। আমাদের স্থবিরতা ভাঙ্গানোর জন্য আমাদের প্রিয় খলীফা প্রত্যেক আহমদীর প্রতিদিনের তবলীগি, তরবিয়তী ও এম,টি,এ দেখার বিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছেন। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক নেতা যখন কোন একটি দেশের সব আহমদীদের তাদের দৈনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট তার সামনে উপস্থাপন করতে বলেন, তখন সহজেই বোঝা যায় যে তিনি আমাদের আলস্যের বিষয়ে কত উদগ্রীব।

আমাদের ওপর তার কত আশা, আমাদেরকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের রিপোর্ট প্রতিদিন দেখছেন। এ ক্ষেত্রে প্রিয় খলীফার এই উদ্যোগকে প্রাণবন্ত করার জন্য এবং তার আস্থা অর্জনের জন্য আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিদিন প্রত্যেক আহমদী যেন তার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত তবলীগ, তরবিয়ত ও এম.টি.এ দেখার বিষয়ে তার রিপোর্ট ফোনে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট/দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জানিয়ে দেন। প্রতিটি জামাত এভাবে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংগ্রহ করে আমীর/প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে তা আমাদের নিকট পৌছাবেন। আমরা তা প্রতিদিন সংগ্রহ করে এবং সংকলিত করে হুযূরের নিকট পেশ করছি।

দেখা যাচ্ছে অনেক সদস্য নিজের রিপোর্ট না দেওয়ার কারণে জামাতের কার্যক্রমের সঠিক পরিসংখ্যান হুযূরের নিকট উপস্থাপন হচ্ছে না। যদি জামাতের প্রত্যেক সদস্য নিজ দায়িত্বে প্রতিদিনের রিপোর্ট স্থানীয় জামাতের মাধ্যমে পাঠান তাহলে বাংলাদেশ জামাতের রিপোর্ট আরো সমৃদ্ধ হবে এবং হুযূর ও আমাদের প্রতি আস্থা পাবেন।

তাই জামাতের প্রত্যেক সদস্যের নিকট বিনীত আবেদন আপনারা কোন কোন বিষয়ে কিভাবে রিপোর্ট দিতে হবে তা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম থেকে জেনে নিন এবং সেই অনুযায়ী তবলীগ, তরবিয়ত ও এম.টি.এ দেখার ব্যবস্থা নিন এবং প্রতিদিনের কার্যক্রমের রিপোর্ট ফোনে জমা দিতে থাকুন। হুযূরের নিকট থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলতে থাকবে। আশা করি সকল আহমদী সদস্য বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিবেন।

সত্যের সন্ধানে

হুযূরের প্রতি সপ্তাহের জুমুআর খুতবার পর এম.টি.এ এর পরবর্তী সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে সত্যের সন্ধানে। হুযূরের খুতবার নিজস্ব আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আছে। আহমদীদের জন্য এটি আধ্যাত্মিক খোরাক এবং তরবিয়তের প্রধান উপাদান। কিন্তু খুতবা দেখার জন্য যে সকল অ-আহমদী বন্ধুদের দাওয়াত করা হয় তারা এই খুতবা শোনার পর তাদের আহমদীয়াত সম্পর্কে অবশ্যই একটি সুধারণা সৃষ্টি হয় এবং তা তবলীগের জন্য বিরাট সহায়ক। ঐ সকল বন্ধুদের যখন সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে আনা হয় তখন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের ভুল ধারণা দূর হয়ে বয়আতের উপযুক্ত হয়ে যায়।

তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে। আমাদের পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব ও অ-আহমদী বন্ধুদের যাদের কাছে আমরা ইমাম মাহ্‌দীর বাণী পৌঁছে দিয়েছি তাদের প্রথমে হুযূরের লাইভ খুতবা শোনানো এবং এরপর সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে তাদের সন্দেহ নিবারন করা। প্রত্যেক আহমদী যার কাছে এম.টি.এ সংযোগ আছে তাদের কাছে অনুরোধ প্রতি শুক্রবার অন্তত ২/১ জন মেহমানকে হুযূরের খুতবা শোনার জন্য তাদেরকে নিজেদের ঘরে দাওয়াত দিন এবং চা-নাস্তা খাওয়ার পর হুযূরের খুতবা শোনান পরবর্তীতে নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে বসান। যাদের বাসায় নিজস্ব এম.টি.এ সংযোগ নাই তারা নিকটস্থ কারও বাসায় বা জামাতী সেন্টারে খুতবা শুনুন এবং মেহমান নিয়ে যাওয়ার পূর্বে স্থানীয় প্রেসিডেন্টকে জানান যাতে উপযুক্ত মেহমান নেওয়াজী করা যায়। তবলীগ করার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব দুর্বলতা/অপারগতার অনেকটাই এম.টি.এ এর মাধ্যমে পূর্ণ করা সম্ভব। সুতরাং এম.টি.এ এর এই নেয়ামতকে আপনারা সাদরে গ্রহণ করে তার পুর্ণ সদ্ব্যবহার করুন।

একটি সতর্কতা

আহমদী মাত্রই অত্যন্ত নরম হৃদয় ও সাহায্যকারী মনোভাব হয়ে থাকে। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোন কোন ব্যক্তি কোন জামাতে বয়আত করে অন্য কোন জামাতে গিয়ে অবস্থান করছেন এবং নিজেকে আহমদী পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জনকে ব্যবসা বাণিজ্যের লোভ দেখিয়ে আর্থিক লেনদেনের চেষ্টা করছেন, কোন কোন সরলমনা আহমদী এই ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করে ক্ষতিগ্রস্থ বা প্রতারিত হচ্ছেন। মু'মিনগণ বুদ্ধিমান ও কৌশলী হয়ে থাকেন এই ধরনের নতুন অর্ধপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে আর্থিক লেনদেনে জড়ানোর ক্ষেত্রে নিজ নিজ বুদ্ধিবিবেক প্রয়োগ করে নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিবেন বলে আশা করি। এ বিষয়ে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট বা কেন্দ্রের কাছ থেকেও তথ্য বা পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

চলুন, আমরা সবাই পরস্পরের জন্য এবং সকলের জন্য প্রতিদিন দোয়া করি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামাতের জন্য দোয়া করি এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের হেদায়াতে ও সুখ শান্তির জন্য দোয়া করি। আমাদের সকল আহমদীর সম্মিলিত দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কবুল করে পৃথিবীতে আমুল পরিবর্তন আনবেন এবং আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে সাফল্য দিবেন, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়াসসালাম
দোয়া প্রার্থী

২৪-০৩-২০১৬

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব

মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.) প্রসঙ্গে বলেছেন:

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

অর্থ: **'যখন তোমরা তাঁর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়াত করবে, যদি বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা, আল্-মাহ্‌দী।'**

[সুনানে ইবনে মাজা, বাব খুরূজুল মাহ্‌দী]

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

Satellite: Eutel Sat E-70B
70.5° East, Frequency 11211 MHz
Symbol Rate: 5111
Polarization: Horizontal
Receiver: DVBS-2

আরো জানার জন্য লগ ইন করুন: **www.mta.tv**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৯৪ সাল থেকে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল (এমটিএ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দিবা-রাত্রি খাঁটি ইসলামের বাণী প্রচার করে বিশ্বের মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বানের কাজ করে যাচ্ছে।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

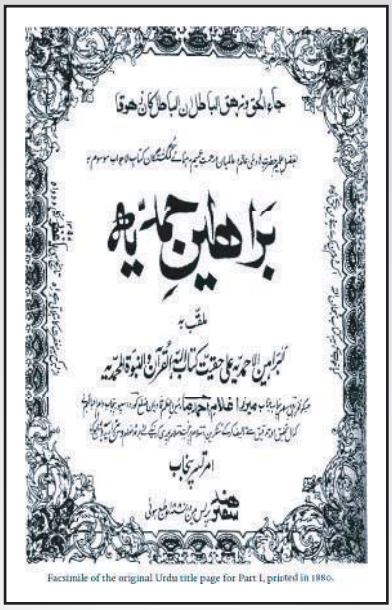

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১৩তম কিস্তি)

দেখার বিষয় হলো, এই নোংরা বিশ্বাস পোষণ করে খোদার গৃহীত বান্দাদের কতটা অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় অসম্মান করা হয়েছে যারা সূর্যের মত আবির্ভূত হয়ে সেই অন্ধকার দূর করেছেন যা তাঁদের সমসাময়িক যুগে ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করে রেখেছিল? এছাড়া তাদের নিজেদের পরমেশ্বর সম্পর্কে কুধারণার চিত্র হলো, তাঁকে তারা উদাসীন, অচেতন বা কান্ডজ্ঞানহীন ভেবেছে।

যিনি এত অজ্ঞ ও অনবহিত যে বেদের পর সহস্র সহস্র ধরনের নিত্য-নতুন বিদাত প্রকাশ পেলো, লক্ষ প্রকার তুফান আঘাত হানলো, ঝড় বয়ে গেলো, হরেক রকম নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিল, তাঁর রাজত্বে মারাত্মক ধরনের এক বিপত্তি দেখা দিল, পৃথিবীবাসীর নতুন সংস্কারের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিল কিন্তু তিনি এমনভাবে ঘুমালেন যে, আর কখনও জাগলেন না। এমনভাবে প্রস্থান করলেন যে, আর ফিরলেন না। যেন তার কাছে কেবল ততটাই ইলহাম ছিল যা বেদের জন্য ব্যয় করে বসেছেন, কেবল সেই মূলধনই ছিল যা বিলিয়ে দিয়েছেন। এরপর চিরতরে রিক্ত-হস্ত হয়ে যান আর মুখে মোহর লেগে যায়। বাকী সবগুণাবলী আজ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও অটুট রয়েছে কিন্তু কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য কেবল বেদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর এরপর তা অকার্যকর হয়ে যায় এবং পরমেশ্বর চিরতরে কথা বলা ও ইলহাম করার শক্তি হারিয়ে বসেন।

এ হলো, আর্যদের বিশ্বাস! যার প্রতি হিন্দুদের আকৃষ্ট করা হয়! একেই আপন ধর্ম হিসেবে অবলম্বন কর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বেদে এই বিশ্বাসের কোথাও উল্লেখ নেই, আর এতে এমন কোন সূত্র (শুরতী) নেই যা সেই বিদ্বেষভাবাপন্ন বাজে ধারনার শিক্ষা দিতে পারে। মনে হয় এই শ্লোক তখন বানানো হয়েছে আর সে যুগে এর জন্ম হয়েছে যখন আর্য ধর্মের বুদ্ধিমানরা নিজেদের গ্রন্থ ও শাস্ত্রে একথাও লিখে দিয়েছিল যে, হিমালয় পর্বত ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলকে বাদ দিলে আর কোন দেশই নেই। অনুরূপভাবে আরও অনেক বাজে ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে যা প্রতিনিয়ত পৃথিবী হতে অপসৃত হচ্ছে আর জ্ঞান অর্জনকারী ও বিবেকবানরা নিজেরাই সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন; কিন্তু এখানে এর উল্লেখ করা বৃথা।

যারা এই গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মালিক সেজে বসেছে, যাদের পবিত্র বেদে অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টিকে বাদ দিলে খোদার অস্তিত্বের নামগন্ধ খুঁজে পাওয়াও দুস্কর; এদের হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও খাতামান নবীঈন (সা.)-কে প্রতারক আখ্যা দেয়া আর তাঁদের পবিত্র যুগকে ধোকা ও প্রতারণার যুগ হিসেবে অভিহিত করা এবং ঐশী সমর্থনের সুমহান দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সফলতাকে ভাগ্য ও দৈব বিষয় অভিহিত করা, তাঁদের পবিত্র গন্থাবলীকে বেদের চোরাইকৃত বিষয়াদি মনে করা, বড়ই পরিতাপের বিষয়। অথচ খোদার পক্ষ থেকে একান্ত প্রয়োজনের সময় তাঁরা তা লাভ করেছেন যার মাধ্যমে পৃথিবীর সুমহান সংশোধন হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, আজ পর্যন্ত বলা

টিকা ৯

এখানে হয়ত কারো হৃদয়ে এ কুমন্ত্রণা দানা বাঁধতে পারে যে, মুসলমানদের বিশ্বাসওতো এটিই যে, ইলহামের সূচনা হযরত আদমের মাধ্যমে হয়েছে আর মহানবীর সত্তায় তা সমাপ্তি লাভ করেছে; সুতরাং এই বিশ্বাসের দৃষ্টিকোন থেকেও মহানবী (সা.)-এর যুগের অবসানে, চিরতরে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়া অবধারিত! এর উত্তরে স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদের মত আমাদের বিশ্বাস মোটেই এটি নয় যে, খোদার কাছে কেবল সে পরিমান কালাম বা কথা ছিল যতটা তিনি প্রকাশ করেছেন; বরং ইসলামের বিশ্বাস অনুসারে খোদার কালাম বা কথা এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর আপন সত্তার মত অসীম। যেমন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

অর্থাৎ, খোদার কথা বা বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্রকে কালিতে পরিণত করা হয় আর লিখতে লিখতে সমুদ্র শুকিয়ে যায় এবং অনুরূপ সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হয় তবুও কথা বা বাণীতে কোন ঘাটতি আসবে না। বাকী থাকলো এ প্রশ্ন যে, আমরা মহানবীর সত্তায় ওহী সমাপ্ত হওয়ার কথা কোন অর্থে বলি? অতএব এক্ষেত্রে সত্য কথা হলো, যদিও ঐশী বাণী নিজগুণে অকূল ও অসীম, কিন্তু সে সকল নৈরাজ্য যার সংশোধনের জন্য ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়ে আসছে বা সেসব ঘাটতি যা খোদার ইলহাম পূর্ণ করে আসছে তা সীমার বাইরে নয় বা অসীম নয়; তাই ঐশী বাণীও ততটা নাযিল হয়েছে যতটা আদম সন্তানের প্রয়োজন ছিল। কুরআন শরীফ এমন যুগে এসেছে যখন সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রয়োজন বা চাহিদা সামনে এসে যায় অর্থাৎ নৈতিক ও বিশ্বাস সংক্রান্ত এবং কথা ও কর্মসংক্রান্ত সব বিষয় বিকৃতির শিকার হয়ে যায়। সকল প্রকার বাড়তি-ঘাটতি এবং সকল প্রকার নৈরাজ্য চরমরূপ ধারণ করে; যে কারণে কুরআন শরীফের শিক্ষাও পরম পর্যায়ের নাযিল হয়।

অতএব এ সকল অর্থের নিরিখে কুরআনী শরিয়ত সর্বশেষ ও সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে আর পূর্বের শরিয়তগুলো রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ, কেননা যেসকল বিশৃংখলার সংশোধনকল্পে পূর্বের বিভিন্ন যুগে ইলহামী পুস্তকাবলী অবতীর্ণ হয় তাও চরম পর্যায়ের ছিল না কিন্তু কুরআনের যুগে সেসব চরম রূপ পরিগ্রহ করে। তাই কুরআন শরীফ ও পূর্ববর্তী ইলহামী গ্রন্থাদির মাঝে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী সকল প্রকার বিপত্তি থেকে মুক্ত থাকলেও শিক্ষা অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে, কোন না কোন সময় উৎকর্ষ শিক্ষা বা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু কুরআনের পর এখন আর কোন গ্রন্থ আসার প্রয়োজন নেই কেননা, উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছার পর পরাকাষ্ঠার কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই (যা অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক)। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন যুগে বেদ ও ইঞ্জিলের ন্যায় কুরআনের সত্য নীতিমালাকেও পৌত্তলিক নীতিমালায় পর্যবসিত করা হবে আর একত্ববাদের শিক্ষাও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হবে বা যদি এর সাথে এটিও ধরে নেয়া হয় যে, কোটি কোটি মুসলমান যারা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারাও কোন যুগে শির্ক ও সৃষ্টিপূজার পথ অবলম্বন করবে; এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য শরিয়ত এবং অন্যান্য রসূলদের আগমন আবশ্যক। কিন্তু উভয় প্রকার ধারণা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব।

কুরআন শরীফের শিক্ষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও প্রক্ষেপণ অসম্ভব কেননা, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر ٨-٩)

অর্থাৎ এ গ্রন্থ আমরা নাযিল করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা বিধানকারী। দেখুন ১৩০০ বছর ধরে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। অতীতের গ্রন্থাবলীর ন্যায় এ গ্রন্থে আজ পর্যন্ত পৌত্তলিকতাপূর্ণ শিক্ষার মিশ্রণ ঘটতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও এতে কোনরূপ পৌত্তলিকতার শিক্ষা অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে যুক্তি বা বিবেক গ্রহণ করবে না; কেননা, লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরআনের হাফেয রয়েছেন। এর হাজার হাজার তফসীর রয়েছে। দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে এর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হয়।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল দেশে এর বিস্তার লাভ, পৃথিবীতে এর কোটি কোটি অনুলিপি বিদ্যমান থাকা, এর শিক্ষা সম্পর্কে সকল জাতির অবহিত হওয়া; এসব বিষয় এমন যার নিরিখে ভবিষ্যতেও কুরআন শরীফে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্তন যুক্তি বা বিবেক অনুসারে অসম্ভব ও অচিন্তনীয়। এছাড়া মুসলমানদের পুনরায় শির্ক বা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হওয়াও অসম্ভব, কেননা, খোদা তা'লা এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে স্বয়ং বলেছেন,

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

অর্থাৎ, শির্ক ও সৃষ্টিপূজা যতটা দূরীভূত হয়েছে তা পুনরায় স্বীয় কোন নতুন শাখা-প্রশাখা গজাতে পারবে না আর পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরেও যাবে না। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কেননা, দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেসকল দেশ থেকে সৃষ্টিপূজা তিরোহিত হয়েছিল সেসব দেশে

(চলমান টিকা)

হয়নি যে, কোন্ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে? বেদের মত কুরআন শরীফের কোনস্থানে অগ্নিপুজার নির্দেশ পাওয়া যায় কি বা কোনস্থানে বায়ু ও জলের ইবাদতের কথা লিখেছে কি? বা কোন যায়গায় আকাশ ও চন্দ্র-সূর্যের প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া হয়েছে কি? বা কোন আয়াতে ইন্দ্র'র মহিমা কীর্তন করে তার কাছে গাভী ও অঢেল ধনসম্পদ চাওয়া হয়েছে কি? যদি এসবের কিছুই না নেয়া হয়ে থাকে যা বেদের সমূহ শিক্ষার নির্যাস ও সার; তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বেদ থেকে কী চুরি করা হয়েছে?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ

পুনরায় শির্ক ও প্রতিমাপূজা একত্ববাদের স্থান দখল করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও যুক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতায় ও বস্তুনিষ্ঠতায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এর কারণ হলো প্রথম যুগে মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের শিক্ষায় কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি বরং প্রতিনিয়ত উন্নতি হয়েছে; সেখানে এখন একত্ববাদীদের সংখ্যা ২০ কোটিরও অধিক; তাই স্খলন কীভাবে সম্ভব? এছাড়া কুরআনের শিক্ষা অবিরত শ্রুতিগোচর করা এবং একত্ববাদীদের স্থায়ী সাহচর্যের কারণে এখন সে যুগ এসে গেছে যখন মুশরিকদের প্রকৃতি কিছুটা হলেও একত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যে দিকেই তাকাও না কেন যুক্তিপ্রমাণ একত্ববাদের বীর সেনাদের ন্যায় শির্কের কাল্পনিক ও অলীক দূর্গে গোলাবারী বর্ষণ করে চলেছে আর একত্ববাদের অন্তর্নিহিত উচ্ছাস বা বৈশিষ্ট মুশরিকদের হৃদয়ে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সৃষ্টিপূজার অট্টালিকা যে অতি দুর্বল ও ভগ্ন-প্রায় তা উন্নত চিন্তাধারার লোকদের সামনে ক্রম-প্রকাশমান আর খোদার একত্ববাদের শক্তিশালী বন্দুক শির্কের কুৎসিত ঝোপড়িগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে চলেছে। অতএব এসকল লক্ষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এখন শির্কের অমানিশা অতীতের মত বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব যখন সারা পৃথিবীর মানুষ, স্রষ্টার সত্তা ও বৈশিষ্ট্যে কৃত্রিম সৃষ্টিকে অংশীদার করে রেখেছিল। কেননা কুরআন শরীফের সত্য নীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া বা এর সাথে পুরো সৃষ্টির ওপর শির্ক ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা ছেয়ে যাওয়া যুক্তির নিরিখে অসম্ভব, সে কারণেই নতুন শরিয়ত ও নতুন ইলহাম নাযিল হওয়া যৌক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। যা অসম্ভাব্যতার দাবি রাখে তা নিজেও অসম্ভবই হয়ে থাকে। তাই প্রমাণিত হলো, মহানবী সত্যিকার অর্থে খাতামুর রসূল –লেখক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন :

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

[প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তক 'নুরুল হক', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানতে লগইন করুন:-
www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org, www.mta.tv

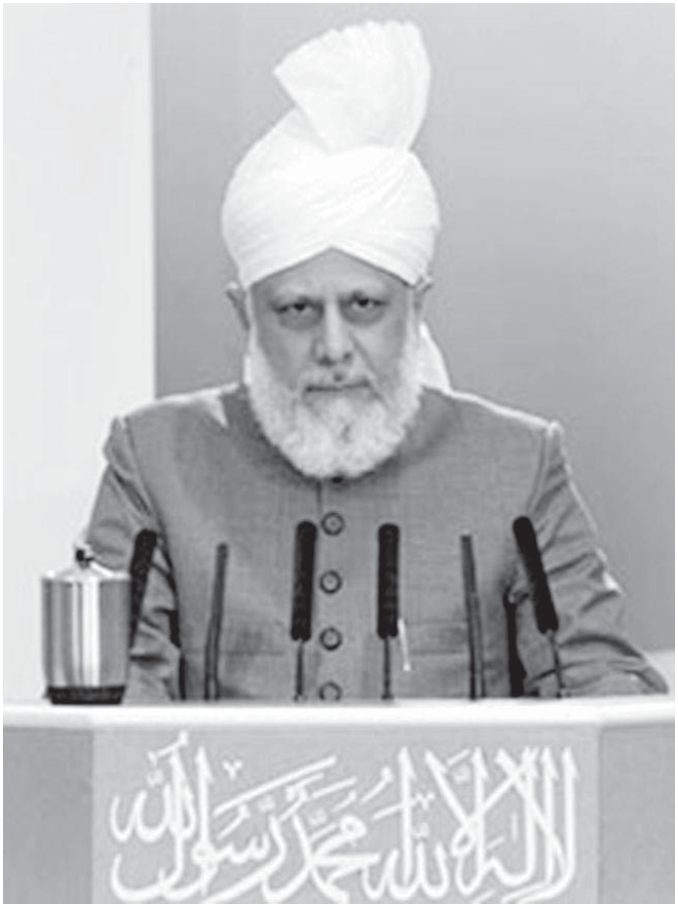

জুমুআর খুতবা

শয়তানের হাত থেকে রক্ষার উপায়

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে (অর্থাৎ শয়তান) অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং করুণা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানি। (সূরা আন্ নূর: ২২)

আদি থেকেই শয়তান মানুষের সাথে শত্রুতা করে আসছে আর চিরকাল শত্রুই থাকবে। এর কারণ এই নয় যে, তার মাঝে স্থায়ীত্বের কোন বৈশিষ্ট্য আছে বরং এই জন্য যে, মানুষের (আধ্যাত্মিক) জন্মের সূচনালগ্নে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কেননা; আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, যারা তাঁর প্রকৃত বান্দা শয়তানের হামলা থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। শয়তানের শত্রুতা প্রকাশ্য কোন শত্রুতা নয় যে, সে সামনে এসে যুদ্ধ করবে বরং শয়তান বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং জাগতিক লোভ-লালসার মাধ্যমে মানুষের আমিত্বকে পুঁজি করে নেকী বা পুণ্য থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয় এবং পাপের নিকটতর করে।

শয়তান আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেছিল, তুমি যেই প্রকৃতি বা স্বভাবমূলে মানুষকে সৃষ্টি করেছ তাহলো সে উভয় দিকেই আকৃষ্ট হতে পারে। আমি তাকে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করাবো কেননা; তার আকর্ষণ বেশি থাকেবে পাপের প্রতি। আমাকে যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি সবদিক থেকে তার ওপর আক্রমন করবো, সব মাধ্যমে তাকে বিভ্রান্ত

করবো। তোমার প্রকৃত বান্দা বা যারা তোমার খাঁটি বান্দা তারাই কেবল আমার আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে। আমার কোন ষড়যন্ত্র, কোন হামলা তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না। কিন্তু এছাড়া তাদের অধিকাংশ আমার পদাঙ্কই অনুসরণ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই অনুমতি দিয়েছেন আর একই সাথে একথাও বলেছেন যে, যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নবী প্রেরণের ধারার সূচনা করে মানুষকে পুণ্যের পথও অবহিত করেছেন আর সংশোধনের রীতি সম্পর্কেও জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যম সম্পর্কেও জ্ঞান দান করেন। আর এটিও সুস্পষ্ট করেন যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সহানুভূতির বাতাবরণে তোমাদেরকে সে কল্যাণ এবং মঙ্গলের প্রতি নয় বরং পাপ ও ক্ষতির দিকে আহ্বান করছে।

আর যখন মানুষের হিসাব-নিকাশের দিন আসবে তখন খুব সহজভাবে ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার সাথে বলবে, আমি তোমাদেরকে পাপ, লোভ-লিপ্সা, গুনাহ্ এবং খোদার নির্দেশ লঙ্ঘনের প্রতি আহ্বান করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তোমরা তো বিবেকবান ছিলে– তোমরা কেন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটাওনি? পাপের প্রতি আমার আহবানকে তোমরা কেন কল্যাণ এবং পুণ্যের প্রতি আল্লাহ্‌র আহ্বানের ওপর প্রাধান্য দিলে? অতএব এখন নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ কর। তোমাদের সাথে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের প্রতি শত্রুতা, যা আমি করেছি, এখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাক। অতএব শয়তান এভাবেই মানুষের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে। পবিত্র কুরআনেও বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শয়তানের হামলা, ছল-চাতুরি আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করেছেন।

আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, শয়তান সবসময় মানুষের পেছনে লেগে থাকে। সে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিল, আমি তার ডান, বাম এবং অগ্র ও পশ্চাত থেকে হামলা করব তাই বড় দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে তার এই হামলা করার ছিল এবং সে তা করে। এমনকি শয়তান একথাও বলে যে, সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সোজা পথে বসে থেকে আমি মানুষের ওপর আক্রমন করবো। এখন এক ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, আমি যেহেতু সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সোজা পথ অনুসরণ করছি তাই আমি শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ। কিন্তু এমন লোকের এরূপ ধারণা ভুল বা অলীক । যাদের ওপর খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে অর্থাৎ যারা মাগযূব এবং যাল্লীন তারাও তো পূর্বে সিরাতে মুস্তাকীমেরই অনুসরণ করছিল। তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা ভ্রষ্টতা এবং শির্‌কে লিপ্ত হয় এবং মহানবী (সা.)-কে অস্বীকার করে বসে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঈমান আনার পরও শয়তান মানুষের পিছু ধাওয়া ছাড়ে না বরং ক্রমাগতভাবে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। অনেকেই তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অর্থাৎ শয়তানের কথায় প্ররোচিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এমনকি যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে তারাও মুরতাদ হয়ে যায় এবং দুরাচারী হয়ে উঠে। অতএব শয়তানের পক্ষ থেকে এই যে হুমকি এটি অনেক বড় এক হুমকি। শুধু খোদার কৃপাই মানুষকে এই ভয়াবহ হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং রক্ষা করে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের শেষের দিকে এই শব্দের মাধ্যমে মু'মিনদের প্রবোধ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হলেন সামী, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা।

অতএব তাঁর দ্বারের কড়া নাড় এবং তাঁকে ডাক এবং অবিচলতার সাথে তাঁকে ডাকতে থাক, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর দরবারে দোয়ায় সেজদাবনত থাক, তাহলে সেই খোদা যিনি সর্বজ্ঞানী এবং বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে যিনি সবিশেষ অবহিত, তিনি যখন দেখবেন, আমার বান্দা সত্যিকার অর্থেইবিশুদ্ধচিত্তে আমাকে ডাকছে তখন তিনি এমন মু'মিনের হৃদয়ে এরূপ এক ঈমানী শক্তি সঞ্চার করবেন যার ফলে সে শয়তানী আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে, ক্রমাগতভাবে পুণ্যের মান উন্নত করার তৌফিক লাভ করবে এবং পাপ থেকে বাঁচার এক শক্তি তার মাঝে সৃষ্টি হবে।

অতএব শয়তান যে বলেছিল, তোমার বিশেষ বান্দারা ছাড়া সবাই আমার অনুসরণ করবে এ সম্পর্কেএকজন বিবেকবান মানুষের চিন্তা করা উচিত। একজন সত্যিকার মু'মিনের চিন্তা করতে হবে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি বান্দা হওয়া যায়। তাঁর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য একটিব্যবস্থাপত্রের কথা আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, আর তাহলো অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চল।

অর্থাৎ প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা কর যা অযথা এবং বাজে, যা খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। যে অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে চলবে খোদার করুণাবারি তাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পরিশুদ্ধ করেন সে-ই পরিশুদ্ধ হতে পারে। এমন পবিত্রদের কাছে এরপর আর শয়তান আসে না।

এখানে এ কথাটিও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তানের হামলা বা আক্রমন আকস্মিকভাবে হয় না, সে ধীরে ধীরে হামলা করে। শয়তান মানুষের হৃদয়ে প্রথমে কোন ক্ষুদ্র পাপ সঞ্চারের মাধ্যমে এই ধারণা সঞ্চার করে যে, এই সামান্য পাপে কিইবা যায় আসে! এটি তো তত বড় পাপ নয়! এই ছোট-খাট পাপই পরবর্তীতে বড় পাপের কারণ হয়ে যায় এবং মানুষকে বড় পাপে প্ররোচিত করে। ডাকাতি বা হত্যাই বড় পাপ গণ্য হবে এটি আবশ্যক নয়। যে কোন পাপ যা সমাজের শান্তি এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তা বড় পাপে পর্যবসিত হয়। তখন মানুষের এই চেতনাই হারিয়ে যায় যে, সে কি করছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি পবিত্র বা পরিশুদ্ধ হতে হয়, যদি খোদার সন্তুষ্টি

অর্জন করতে হয় তাহলে যেখানে অবিচলতার সাথে পাপমুক্ত থাকার চেষ্টার মাধ্যমে শয়তানের পদাঙ্ক এড়িয়ে চলতে হবে সেখানে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করে যাওয়াও আবশ্যক। সবসময় খোদা তা'লাকে ডাকা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া আবশ্যক। এছাড়া শয়তানের হামলা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে না। এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। অনেকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে সৃষ্টিই করলেন কেন? প্রথম দিনই তার ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে ধ্বংস করলেন না কেন? প্রথম দিনই যদি তাকে ধ্বংস করে দেয়া হতো তাহলে পৃথিবীতে আর কোন নৈরাজ্যই মাথাচাড়া দিত না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, সবাইকে স্বীকার করতে হয় যে, সব মানুষের জন্য দু'টো 'জাযেব' বা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। একটি আকর্ষণী শক্তি হলো পুণ্য বা কল্যাণ যা নেকীর প্রতি আকৃষ্ট করে। আর দ্বিতীয় আকর্ষণী শক্তি হলো,'শর' বা অনিষ্ট যা পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে।

উদাহারণ স্বরূপ এ বিষয়টি সবারই জানা এবং পরিক্ষিত বা স্বীকৃত যে, অনেক সময় মানুষের হৃদয়ে পাপের ধারণা জন্মে আর তখন সে এমনভাবে পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যে, যেন কেউ তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আর অনেক সময় তার হৃদয়ে পুণ্যের ধারণা জাগ্রত হয় আর তখন সে পুণ্যের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যেন কেউ তাকে পুণ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর প্রায় সময় এক ব্যক্তি পাপ করে পুনরায় পুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খুবই লজ্জিত হয় যে, আমি পাপ করেছি।

আর অনেক সময় এক ব্যক্তি কাউকে গালি দেয় বা প্রহার করেএরপর তার অনুশোচনা হয় আর সে মনে মনে বলে, আমি খুবই অন্যায় কাজ করেছি, এরপর সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে বা ক্ষমা চায়। (অর্থাৎ তার মাঝে অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা জন্মে। তিনি (আ.) বলেন,) এই উভয় প্রকার শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে বিরাজমান। (আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতিতে এগুলো সৃষ্টি করেছেন)। ইসলামী শরীয়তে পুণ্যের শক্তির নাম 'লিম্মায়ে মালাক' বা ফিরিশ্‌তা-প্রসূত ধ্যান-ধারণা রাখা হয়েছে আর পাপের শক্তিকে 'লিম্মায়ে শয়তান' বা শয়তান-প্রসূত ধ্যান-ধারণা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, দার্শনিকেরা শুধু এতটাই বিশ্বাস করে যে, এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝে অবশ্যই বিদ্যমান(অর্থাৎ পাপের অপশক্তি এবং পুণ্যের শুভশক্তি, কিন্তু ইসলামী শরীয়ত পুণ্যের শক্তিকে 'লিম্মায়ে মালাক' আখ্যায়িত করেছে আর পাপের অপশক্তিকে 'লিম্মায়ে শয়তান' আখ্যায়িত করেছে।) তিনি (আ.) বলেন, যদিও দার্শনিকেরা শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করে, এই উভয় শক্তি প্রত্যেক মানুষের মাঝে রয়েছে কিন্তু খোদা তা'লা যিনি মহা অদৃশ্যের পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা রহস্যাবলী প্রকাশ করে থাকেন, অনেক দূরের এবং অনেক গুপ্ত ও সুপ্ত রহস্যাবলী যিনি প্রকাশ করেন আর গুপ্ত ও সুপ্ত বিষয়াদিরও যিনি সংবাদ দেন, তিনি এই উভয় শক্তিকে 'মাখলূক' বা সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যে পুণ্যের প্রেরণা যোগায় তার নাম ফিরিশ্‌তা এবং রূহুল কুদূস রেখেছেন আর যে পাপের প্ররোচনা দেয় তার নাম শয়তান এবং ইবলীস রেখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধিমান এবং দার্শনিকেরা একথা স্বীকার করেছেন যে, ইলক্বা বা প্রেরণার বিষয়টি অমূলক নয়।

তারা এটি মানেন যে, এবিষয়টি একটি সঠিক ও সত্য বিষয়। মানব হৃদয়ে পাপের প্ররোচনাও জাগে আর পুণ্যের প্রেরণাও সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) এর ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন,

এই উভয় শক্তি সব মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। তোমরা এগুলোকে দু'টো শক্তিও আখ্যায়িত করতে পার বা রূহুল কুদূস এবং শয়তানও বলতে পার কিন্তু যাই হোক না কেন এ দুইয়ের অস্তিত্বকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলো সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হলো, মানুষের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে প্রতিদান লাভের যোগ্যতা অর্জন করা। মানব প্রকৃতি যদি সৎকাজ করতে বাধ্য হতো আর পাপের প্রতি স্বভাবজই ঘৃণা রাখতো, তাহলে সে নেক কর্মের বিন্দুমাত্রও প্রতিদান পেত না কেননা; তখন এটি তার প্রকৃতিগত বা সহজাত বৈশিষ্ট্য হতো। কিন্তু যেখানে তার ফিতরত বা প্রকৃতি দু'টো আকর্ষণের মাঝে অবস্থান করে আর সে পুণ্যের আকর্ষণী শক্তির আনুগত্য করে সেখানে এর জন্য সে প্রতিদান লাভ করে।

তিনি (আ.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানব হৃদয়ে দু'ধরণের ইলক্বা বা প্রেরণার সঞ্চার হয়, একটি হলো পুণ্যের প্রেরণা এবং অপরটি পাপের প্ররোচনা। এখন এটি জানা কথা যে, এই উভয় প্রকার ইলক্বা বা প্রেরণা জন্মগতভাবে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে না (অর্থাৎ জন্মের সময় এগুলো তার অংশ ছিল না) কেননা; এগুলো একটি অন্যটির বিরোধী বা বিপরীত। (পাপ এবং পুণ্যের মাঝে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। এটি হতেই পারে না যে, শৈশবেই কোন বাচ্চার প্রকৃতিতে পাপ এবং পুণ্য উভয়টি বিরাজমান থাকবে।) তিনি (আ.) বলেন, এগুলো পরস্পর বিরোধী এবং এগুলোর ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই প্রমাণিত হলো, এই উভয় প্রেরণা এবং প্ররোচনা বাহির থেকে আসে, (মানুষ পুণ্যের এবং পাপের প্রভাব বাহির থেকেই গ্রহণ করে। মানুষ যে ধীরে ধীরে পুণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায় বা পাপের ক্ষেত্রে অধঃপতিত হয় এর প্রভাব বাহির থেকেই আসে।)

তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উৎকর্ষতা এর ওপরই নির্ভরশীল আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই উভয় প্রকার সত্তা অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা এবং শয়তানকে হিন্দুদের গ্রন্থও মানে, আর অগ্নি পূজারীরাও এ দু'টোর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যত ঐশী গ্রন্থ এই পৃথিবীতে এসেছে এর প্রত্যেকটিতে এই উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাই আপত্তি করা শুধু অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ বৈ কিছু নয়। এর উত্তরে শুধু এতটুকু লেখাই যথেষ্ট, যে ব্যক্তি পাপ এবং দুস্কৃতি থেকে

বিরত হয় না সে স্বয়ং শয়তান হয়ে যায়। যেভাবে এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মানুষও শয়তান হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা কেন তাদেরকে শাস্তি দেন না, এই মর্মে যে-ই প্রশ্ন করা হয় এর উত্তর হলো, শয়তানকে শাস্তি দেয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই সেই প্রতিশ্রুত দিনের অপেক্ষায় থাকা উচিত। (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি শাস্তি দিব এবং অবশ্যই দিব। কখন দিব? এর উত্তর হলো, এই পৃথিবীতে হোক বা পরকালে, নির্ধারিত সময়ে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।) অনেক শয়তান ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তা'লার হাতে শাস্তি পেয়েছে আর অনেকেই পাবে।

এরপর কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে শয়তান মানুষকে আহ্বান করে? কোন্ কোন মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে? আর এমন কীকী বিষয় আছে যা অবলম্বন করে মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে রক্ষা পায়? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

শয়তান মিথ্যা, অন্যায়, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-উচ্ছাস, হত্যা, উচ্চাভিলাষ, লোকদেখানো আর অহংকারের দিকে আহ্বান করে এবং আমন্ত্রণ জানায়। অর্থাৎ বড় বড় লোভ দেখায় এবং ভালোবাসার সাথে আহ্বান করে যে, আস এই পাপে জড়িয়ে পড়। পক্ষান্তরে বিপরীতে রয়েছে অনিন্দ্য সুন্দর নৈতিক গুণাবলী। আর তাহলো ধৈর্য, পূর্ণ নিমগ্নতা, আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হওয়া, নিষ্ঠা, ঈমান এবং সাফল্য। এগুলো হলো খোদা তা'লার আমন্ত্রণ। একদিকে রয়েছে শয়তানের প্রলোভন আর অপরদিকে পুণ্যের প্রতি খোদা তা'লা আমন্ত্রণ। মানুষ এই উভয় আকর্ষণী শক্তির মাঝে পড়ে আছে। অর্থাৎ এই উভয়টির মাঝে ম্যাগনেটিজম বা আকর্ষণকারী এক শক্তি রয়েছে।

যার প্রকৃতি নেক,যার ভেতরে পুণ্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সে শয়তান এবং তার সহস্র সহস্র আমন্ত্রণ ও প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই সুস্থ প্রকৃতি, নেক স্বভাব এবং শান্তিপ্রিয় বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ শয়তান তাকে যতই ডাকুক না কেন যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লা নেক ও পুতঃ প্রকৃতি নিহিত রেখেছেন সে নিজের পুণ্যের কল্যাণে খোদা তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ এমন প্রকৃতি যার আছে সে-ই খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খোদা তা'লা তখন তাকে শয়তানের প্রতি ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে খোদার দিকে ধাবিত হওয়ার তৌফিক দান করেন, আর খোদা তা'লার সত্তাতেই সে প্রশান্তি, প্রবোধ এবং সুখ খুঁজে পায়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন,প্রতিটি বস্তুর অবশ্যই কিছু না কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রয়েছে। যতক্ষণ তাতে সেই চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া না যাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। দেখ! চিকিৎসকরা ঔষধ আবিস্কার করে থাকেন। বনফ্‌সা (বেগুনী ফুল) শসা বা ক্ষিরা এবং জামাল গোটা (এগুলো এমন ফল বা গুল্মলতা যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়) ইত্যাদিতে যদি সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকে যা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর প্রমাণিত হয়েছে (যার মাধ্যমে কতিপয় রোগ নিরাময় হয়) আর চিকিৎসকেরা যদি নিশ্চিত হন যে এগুলোতে সেই বৈশিষ্ট্য নেই তাহলে তারা তা পরিত্যাজ্য বস্তুর মতো ছুড়ে ফেলে দেবেন।

অনুরূপভাবে ঈমানের লক্ষণাবলীও একটি সত্য বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ গ্রন্থে বারবার এগুলোর উল্লেখ করেছেন। এটি সত্য কথা যে, মানুষের মাঝে ঈমান প্রবেশ করতেই আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ, পবিত্রতা, তাঁর গরিমা, তাঁর শক্তি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র প্রকৃত অর্থ ও মর্ম তার জীবনে প্রতিভাত হয়। আর এক পর্যায়ে খোদা তার হৃদয় মন্দিরে আসন গ্রহণ করেন। তখন তার ওপর এক প্রকার মৃত্যু আসে আর পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ স্বভাব তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়। এটিই সেই প্রকৃতিগত সৌভাগ্য যে, সঠিক ঈমান থাকলে পাপাচারে জর্জরিত জীবনের ওপর এক মৃত্যু আসে এরপর একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়। আর সেটিই আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে থাকে বা এভাবে বলতে পার যে, সেটি তার আধ্যাত্মিক জন্মের প্রথম দিন হয়ে থাকে। মানুষের শয়তানী জীবনের ওপর যখন মৃত্যু আসে আর এক শিশুর জন্মের ন্যায় তার আধ্যাত্মিক জীবনের যখন সূচনা হয় তখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায়।

এরপর অহংকার এবং শয়তানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

সর্বপ্রথম আদমও পাপ করেছিল। ধর্মের ইতিহাসে আদমের পাপের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর শয়তানও পাপ করেছিল। পাপ দু'টো ছিল, একটি পাপ আদম করেছিল আর অন্যটি করেছিল শয়তান। কিন্তু আদমের মাঝে অহংকার ছিল না আর এ কারণেই সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পাপ স্বীকার করেছে এবং তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। এ কারণেই মানুষের ক্ষেত্রে তওবার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। যদি তার অহংকার না থাকে, মানুষ যদি পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা করে আর খোদার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে সে ক্ষমা পায় আর আশা করা যায়, খোদা তা'লা ক্ষমা করবেন। কিন্তু শয়তান অহংকার করেছে এবং অভিশপ্ত হয়েছে। মানুষের মাঝে যা নেই, যেই বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে নেই, এক অহংকারী অযথ সেই গুণের দাবী করতে উদ্যত হয়। তোমার অহংকার করার মত যোগ্যতাই নেই, তোমার সামর্থই বা কতটুকু? কতটা উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে? যেখানে সবকিছু অর্জনের শক্তিই নেই সেখানে অহংকারের কারণ কী?

তিনি (আ.) বলেন, অহংকারী অনর্থক সে বিষয়ের দাবি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় যা তার মাঝে নেই। নবীরা অনেক কুশলী হয়ে থাকেন, তাদের অনেক দক্ষতা থাকে, যার একটি হল আত্মবিলুপ্তি। তাঁরা নিজেদের অহমিকাকে পিষ্ট করেন। তাঁদের মাঝে আত্মম্ভরিতা থাকে না, তারা নিজেদের জীবনে এক মৃত্যু আনয়ন করেন। বড়াই বা গরিমা তো একমাত্র খোদা তা'লারই সাজে। যারা অহংকার করে না এবং বিনয়াবনত জীবন কাটায় তাঁরা ধ্বংস হয় না। অতএব অহংকার পরিহার কর।

এগুলো হলো সেসব বৈশিষ্ট্য যা এক মু'মিনের অবলম্বন করা উচিত। নতুবা সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী হবে। মানুষ অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না যে, তার মাঝে অহংকার রয়েছে। তাই সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। শয়তান কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ষড়যন্ত্র করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

মানুষের কর্ম যদি পাপমুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পাপাচারে কলুশিত কোন কাজ যদি সে না করে, এমন কোন কাজ যদি সে না করে যাকে পাপ বলা যায়, তাহলে শয়তান চোখ, কান, নাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বাহ্যতঃপাপাচারপূর্ণ কোন কাজ না করলেও শয়তান মানুষের চোখ, কান এবং নাকে আসন গেড়ে বসে থাকতেচায়। আর সেখানেও যদি সে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে সে চায়, নিদেনপক্ষে যেনমানুষের হৃদয়েই যেনপাপ বিরাজমান থাকে।

অনেকেই বাহ্যতঃ কোন পাপ করে না বা বড় পাপে লিপ্ত হয় না এমনকি ছোট বা ক্ষুদ্র পাপেও জড়ায় না। অনেকে সেই সুযোগই পায় না, বা পাপ করার কোন কারণই খুঁজে পায় না, বা কারো ভয়ে সে পাপ করে না। বাহ্যতঃ এবং কার্যতঃ তারা কোন পাপ করে না কিন্তু এরপরও শয়তানের কারসাজি অব্যাহত থাকে। যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে কোন না কোন ভাবে মানুষের ভেতর পাপের বীজ বপন করতে চায়, তার হৃদয়ে আসন গেঁড়ে বসতে চায়। তিনি (আ.) বলেন, শয়তান নিজের যুদ্ধ বা অপচেষ্টাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় কিন্তু যে হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে সেখানে শয়তানী রাজ বা শয়তানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদি কোন হৃদয়ে খোদার ভয় থাকে তাহলে প্রশ্নই উঠে না যে, শয়তান সেই হৃদয়ে পাপের বীজ বপন করতে সক্ষম হবে। তিনি (আ.) বলেন, অবশেষে শয়তান এমন ব্যক্তির বিষয়ে নিরাশ হয়ে যায়, পৃথক হয়ে যায়। নিজের বড়াই বা অহমিকায় ব্যর্থ হয়ে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তাকে সেখান থেকে চলে বিদায় নিতে হয়। সেই হতভাগা সেখান থেকে প্রস্থান করে।

আসল বিষয় হলো, মানুষের হৃদয়ে খোদাভীতি বিরাজ করা। খোদাভীতি বা খোদার ভয় যদি থাকে তাহলে মানুষ অনেক পাপ এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়। এক চোরও যদি চুরি করার সময় জানতে পারে যে, একটি শিশু তাকে দেখছে সে সেই শিশুকেও ভয় করে।

অতএব যতদিন এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি না হবে বা যতক্ষণ হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল না হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতিটি কর্মকে দেখছেন, ততক্ষণ মানুষের জন্য পাপ এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। শয়তান অনেক সময় পুণ্য বা নেকীর দোহাই দিয়েও মানুষকে নিজের পিছনে পরিচালিত করে। একবার কোন বৈঠকে ইলহাম এবং হাদীসুন নফ্স অর্থাৎ মনগড়া কথার মাঝে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হয় । সত্য ইলহাম কোনটি তা বোঝা অনেক কঠিন একটি বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা আর আল্লাহ্ তা'লার ইলহামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। আসলে কোন এলহাম মনগড়া কথা বা শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে কিন্তু সেটিকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম ভেবে বসে আর এভাবে প্রতারিত হয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যেই কথা আসে তা প্রতাপান্বিত এবং প্রশান্তিকর হয়ে থাকে, হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে তা প্রবেশ করে, আল্লাহ্‌র হাত থেকে তা উৎসারিত হয়, এর সমকক্ষ কোন শব্দ বা বাক্য হতে পারে না, এটি লোহার মত হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আছে, "ইন্নাসানুলকি ক্বাউলান সাকিলা" (সূরা আল্ মুয্যাম্মেল: ০৬)

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এক অত্যন্ত গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করতে যাচ্ছি। "সাকিলা" শব্দের অর্থ এটিই। কিন্তু শয়তান এবং প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা এমন হয় না। মনগড়া কথা আর শয়তান যেন একই বিষয়ের দু'টো ভিন্ন নাম। দু'টো শক্তি মানুষের চিরসাথী যার একটি হলো, ফিরিশ্‌তা আর অপরটি হলো শয়তান। অর্থাৎ তার পায়ে যেন দু'টো রশি বাধা থাকে। ফিরিশ্‌তা পুণ্যের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে, যেমনটি পবিত্রকুরআনে আছে "আইয়্যাদাহুম বিরুহিমমিনহু" (সূরা আল্ মুজাদেলা: ২৩) অর্থাৎ নিজের বাণী অবতীর্ণ করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেছেন। আর শয়তান পাপে উৎসাহিত করে, যেমনটি কুরআনে আছে, "ইউওয়াসুভিসু" (সূরা আন্‌নাস: ০৬)। এই উভয়টিকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আলো ও অন্ধকার সহাবস্থান করে। কোন জিনিষের জ্ঞান না থাকার অর্থ এটি নয় যে, সেই জিনিষের অস্তিত্বই নেই। কোন কথার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে এর অর্থ এটি করা যাবে না যে, সেই কথার কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি বলেন, এই জগৎ ছাড়াও আরো সহস্র সহস্র বিস্ময়কর বিষয়াদি রয়েছে। এই বিশ্বজগত যা একটি অসাধারণ বিস্ময়, এছাড়াও খোদা তা'লার সহস্র সহস্র বিস্ময় রয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, "ক্বুল আউযুবিরাব্বিন্নাস" (সূরা আন্‌নাস: ০২) আয়াতে শয়তানের সেই সব কুমন্ত্রণারই উল্লেখ রয়েছে যা সে আজকাল মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করছে। বিশেষ করে এ যুগে, যেটিকে আধুনিক যুগ বলা হয় এবং যে যুগে মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলতে বসেছে, শয়তানই সত্যিকার অর্থে হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করছে। আর সবচেয়ে বড় কুমন্ত্রণা হলো, রবুবিয়্যত সম্পর্কে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করা। যেভাবে ধনাঢ্যদের হাতে অঢেল ধন-সম্পদ দেখে মানুষ বলে বসে, এই লালন-পালনকারী, এ ব্যক্তিই আমার সব কিছু। শয়তান কীভাবে কুমন্ত্রণা জোগায় এ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আর ধনীরাই আমাদের চাহিদা পুরণ করে বা অভাব দূর করে বা আল্লাহ্ ছাড়াও কোন অস্তিত্ব আছে যে আমাদের অভাব মোচন করতে পারে মর্মে যে কুমন্ত্রণা রয়েছে তা থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়?

এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এ কারণেই সত্যিকার প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই দোয়া কর যে, আমি মানব জাতির প্রকৃত প্রতিপালকের আশ্রয়ে আসতে চাই।

এরপর মানুষ দুনিয়ার বাদশাহ্ এবং শাসকদেরকে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববান আখ্যা দেয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে "মালিকিন্নাস" (সূরা আন্‌নাস: ০৩) অর্থাৎ মানুষের একমাত্র মালিক হলেন, আল্লাহ্ তা'লা।

মানুষের কুমন্ত্রণার ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সে সৃষ্টিকে খোদার সমকক্ষ জ্ঞান করে বসে এবং আশা-আকাঙ্খা ও ভয়কে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে। এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে "ইলা হিন্নাস" " (সূরা আন্‌নাস: ০৪) অর্থাৎ তোমাদের একমাত্র উপাস্য হলেন, আল্লাহ্ তা'লা।

এই হলো তিনটি কুমন্ত্রণা যা দূরীভূত করার জন্য সূরা নাসে উপরোক্ত তিনটি তাবিয বা রক্ষাকবচের উল্লেখ করা হয়েছে। আরএসব কুমন্ত্রণা সঞ্চারকারী হলো খান্নাস বা শয়তান, তওরাতে হিব্রু ভাষায় তার নাম 'নাহাস' রাখা হয়েছে যে হাওয়ার কাছে এসেছিল এবং যে অজান্তে হামলা করে বা আক্রমণ করে। এই সূরায় তার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এটি থেকে বুঝা গেল, দাজ্জালও জোর জবরদস্তি করে কিছু করবে না বরং গুপ্ত হামলা করবে যেন কেউ জানতেই না পারে।

বর্তমান যুগের চাকচিক্য, আধুনিক যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কারাদী বা আধুনিক শিক্ষার নামে খোদা এবং ধর্মের সাথেযে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যার পিছনে বিভিন্ন সরকার এবং বড় বড় সংগঠনকলকাঠি নাড়ছে। মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন কথা বলা হয় যে, দেখ! ধর্ম তোমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে অথচ মানবাধিকারের দাবি হলো, মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা! এমন সব কথা ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করা হয় আর এ যুগে শয়তানইএসব কাজ করছে। বিভিন্ন সরকারও এর অন্তরালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে আর নারী অধিকারের নামে বা মানবাধিকারের নামে যা আমি পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন সংগঠন এই অপকর্ম করছে। যেখানেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার বা দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানেই সবার বোঝা উচিত, সব আহমদীর বোঝা উচিত এবং সব মু'মিনের বোঝা উচিত যে, এখানে শয়তান আমাদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে আর এরাই হলো, দাজ্জালী অপশক্তি ।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, এটি ভুল কথা যে, শয়তান স্বয়ং হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং বর্তমানে সে যেভাবে গুপ্ত হামলা করে তখনও তাই করেছিল। সে এমন কোন ব্যক্তি বা সত্তা ছিল না যে হাওয়ার কাছে গিয়েছিল বরং সে এভাবেই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করেছিল ।সে কারো হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে আর সেই কুমন্ত্রণাই শয়তানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। কোন এক ধর্ম-বিরোধীর হৃদয়ে শয়তান এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করেছিল। আর আদম যেই জান্নাতে থাকতেন তাও এই পৃথিবীতেই ছিল, তাবায়বীয় কোন জান্নাত ছিল না। কোন পাপাচারী তাঁর হৃদয়ে এই কুমন্ত্রণা সঞ্চার করে।

পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা এই তাকিদপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, "মাগযুবে আলাইহীম" এবং "যোয়াল্লিন"দের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে না। এতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কিছু মুসলমান এমনটিই করবে অর্থাৎ এমন এক যুগ আসবে যখন তাদের মাঝে অনেকেই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে। নির্দেশ সব সময় এমন বিষয়েই দেয়া হয় যে বিষয় সম্পর্কে এই আশঙ্কা থাকে যে, কিছু মানুষ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে।

পুনরায় ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া সংক্রান্ত বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, দেখ! মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি শ্রেণী তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মগ্ন হয়ে যায়। আর শয়তান তাদের মাথায় ভর করে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ, না, সাহাবীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর সেই সাথে ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকার বা প্রকৃত জ্ঞান যা তাদের হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করে, সেই ঈমানও অর্জন করেছেন। এ কারণেই কোন ক্ষেত্রে শয়তানের আক্রমণে তারা দোদুল্যমান হন নি। আর কোন কিছুই সত্যের বহিঃপ্রকাশ থেকে তাদের বিরত রাখতে পারে নি।

আমার কথার একমাত্র অর্থ হলো, যারা সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদিতার বান্দা বা দাস হয়ে যায় এবং জগৎ পূজারী হয়ে যায়, এমন মানুষের ওপর শয়তান প্রভুত্ব করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো তারা, যারা ধর্মের উন্নতির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এই দলকে 'হিযবুল্লাহ্' বলা হয় আর এরাই শয়তান আর তার বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়।

ধনসম্পদ যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাই আল্লাহ্ তা'লাও ধর্মের উন্নতি এবং ধর্মের সন্ধানকে এক প্রকার ব্যবসাআখ্যা দিয়েছেন। ধর্মের সন্ধান অর্থাৎ সত্য ধর্মের তালাশএবং ধর্মের উন্নতিরচেষ্টা, এটিও এক ধরনের ব্যবসা। জাগতিক ধন-সম্পদ তো এই পৃথিবীতেই থেকে যাবে কিন্তু এই সম্পদ বা এই বাণিজ্য পরবর্তী জীবনেও কাজে আসবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى
تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

(সূরা আস্‌সাফ: ১১) অর্থাৎ আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসা বা বাণিজ্যের সংবাদ দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বা আযাব থেকে রক্ষা করবে।

তিনি (আ.) বলেন, সর্বোত্তম ব্যবসা হলো, ধর্মের উন্নতির ব্যবসা করা যা মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করে। নিজের জামাতকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন , আমিও আল্লাহ্ তা'লার ভাষায় তোমাদের বলছি,

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى
تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অতএব আমাদের এমন ব্যবসা-বাণিজ্যই করা উচিত। সেসব পথ অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত, যে পথের দিকে যুগ ইমাম এবং খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ, প্রতিশ্রুত

যত বাজে, ঘৃণ্য, হীন ও ইতর অভ্যাস রয়েছে, যার ওপর শয়তান পরিচালনা করতে চায় তা যতদিন পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়।

মসীহ্ এবং মাহদী আমাদেরকে ডাকছেন যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এরপর গুপ্ত বা অপ্রকাশিত পাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই পাপ এড়িয়ে চল। কেউ যখন সমস্যা কবলিত হয় তখন এর জন্য সত্যিকার অর্থে মানুষ নিজেই দায়ী হয়ে থাকে। কোন সমস্যা কবলিত হওয়ার পর একথা বলা যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই সমস্যা এসেছে, এটি ঠিক নয় বরং মানুষ নিজেই দোষী হয়ে থাকে, এটি আল্লাহ্ তা'লার দোষ নয়। অনেকেই বাহ্যতঃ খুবই পুণ্যবান হয়ে থাকে আর মানুষ আশ্চর্য হয়, সে কেন কোন পরীক্ষায় নিপতিত হল বা কোন পুণ্যার্জনে সে কেন ব্যর্থ হল? কিন্তু সত্যিকার অর্থে তার সুপ্ত এবং গুপ্ত পাপ থেকে থাকে যা তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু অতীব ক্ষমাশীল এবং মার্জনা করে থাকেন, তাই মানুষের গুপ্ত এবং অপ্রকাশিত পাপ সম্পর্কে কেউই জানতে পারে না। কিন্তু গুপ্ত পাপ প্রকাশ্য পাপের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য হয়ে থাকে। পাপ আসলে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির মত হয়ে থাকে। বড় বড় রোগ-ব্যাধি বা বাহ্যিক রোগ সবার চোখে পড়ে (যা দেখে মানুষ বলে যে) যেমন অমুক ব্যক্তি অমুক রোগে আক্রান্ত।কিন্তু কিছু কিছু এমন গুপ্ত এবং সুপ্ত ব্যাধি রয়েছে যে, অনেক সময় রোগী নিজেও বুঝে উঠতে পারে না যে, আমি কোন হুমকির সম্মুখীন। এমনই একটি রোগ হলো টিবি বা যক্ষা। অনেক সময় প্রথম দিকে চিকিৎসকও বুঝে উঠতে পারে না আর এক পর্যায়ে রোগ প্রকট রূপ ধারণ করে। অনেক সময় শেষ পর্যায় গিয়ে জানা যায়। কিছু মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে, বাহ্যতঃ তাদেরকে ভালো ও সুস্থ বলে মনে হলেও হঠাৎ করে জানা যায় যে, সে ক্যান্সারে আক্রান্ত আর এমনপর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে এটি দুরারোগ্য। ক্যান্সার ছড়িয়ে গিয়ে থাকে আর কয়েক মাসের ভেতরেই মানুষ মারা যায়।

যেভাবে রোগের কথা বুঝা যায় না তেমনটি মানুষের আভ্যন্তরীণ পাপের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য যা ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে। আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজ সন্নিধান থেকে করুণা করেন তাহলেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কুরআনে আছে "ক্বাদ আফলাহা মানযাক্কাহা" (সূরা আশ্‌শামস: ১০) অর্থাৎ যে আত্মশুদ্ধি করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে। কিন্তু আত্মশুদ্ধিও এক প্রকার মৃত্যুরই নামান্তর। যতক্ষণ সমস্ত ঘৃণ্য স্বভাব এবং চরিত্র পরিত্যাগ না করা হবে আত্মশুদ্ধি অর্জন কী করে সম্ভব হতে পারে? যত বাজে, ঘৃণ্য, হীন ও ইতর অভ্যাস রয়েছে, যার ওপর শয়তান পরিচালনা করতে চায় অর্থাৎ শয়তান যে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় পথে পরিচালিত করতে চায়, তা যতদিন পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়।

'মুনকার' শব্দের অর্থই হলো, এমন সব বিষয় যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। যতক্ষণ সকল নীচ ও ইতর অভ্যাস পরিত্যাগ না করা হবে আত্মশুদ্ধি কী করে লাভ হতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতর কিছু না কিছু অনিষ্ট বা পাপের উপকরণ থেকেই থাকে, আর তা-ই তার জন্য শয়তান হয়ে থাকে। যতক্ষণ তাকে হত্যা না করবে কোন সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্ত খোদার আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। শয়তানকে মারার জন্য কী প্রয়োজন এবং কীভাবে আমাদের প্রদক্ষেপ নেয়া উচিত- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

নবীরা খোদার বিকাশস্থল এবং খোদা দর্শনের আয়না হয়ে থাকেন। আর সত্যিকার মুসলমান এবং সত্যিকার বিশ্বাসী তারা হয়ে থাকে যারা নবীদের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব হয়ে হন। সম্মানিত সাহাবীগণ এ রহস্যকে ভালভাবে অনুধাবন করেছেন, আর তারা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে এমনভাবে বিলীন হয়েছেন, এমনভাবে আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছেন যে, তাদের সত্তায় আর কিছু অবশিষ্টই ছিল না। যে-ই তাদেরকে দেখতো, খোদার মাঝে বিলীন পেত, খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় আর মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বনের প্রচেষ্টায় তারা নিমগ্ন ছিলেন।

স্মরণ রেখ! এ যুগে যত দিন সেই নিমগ্নতা এবং সেই বিলীনতা, সেই আত্মবিলুপ্তির বৈশিষ্ট্য যা সাহাবীদের মাঝে ছিল, না হবে ততদিন মুরীদ বা ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি সত্য প্রমাণিত হতে পারে না। এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও, যতদিন খোদা তোমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ না করবেন এবং ঐশী গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে প্রকাশ না পাবে ততদিন শয়তানী রাজত্ব তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে।

খোদা তা'লা আমাদেরকে একশত ষোলআনা খোদা তা'লার হয়ে যাওয়ার তৌফিক দিন। সব অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে মুক্ত থেকে, সকল পাপ এড়িয়ে, সকল অহংকার থেকে দূরে থেকে, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখে আমরা যেন খোদার কৃপাভাজন হতে পারি। আমাদের দৃষ্টি সদা সর্বদা যেন খোদার সত্তায় নিবদ্ধ থাকে, সব সময় তিনিই যেন আমাদের প্রতিপালক প্রমাণিত হন। বাদশাহ্ হিসেবে সব সময় আমাদের হৃদয়ের যেন তাঁরই নিয়ন্ত্রণ থাকে, তিনিই যেন আমাদের উপাস্য হন আর সব সময় আমরা যেন তাঁকেই ডাকি আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে যেন আমরা নিরাপদ থাকি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

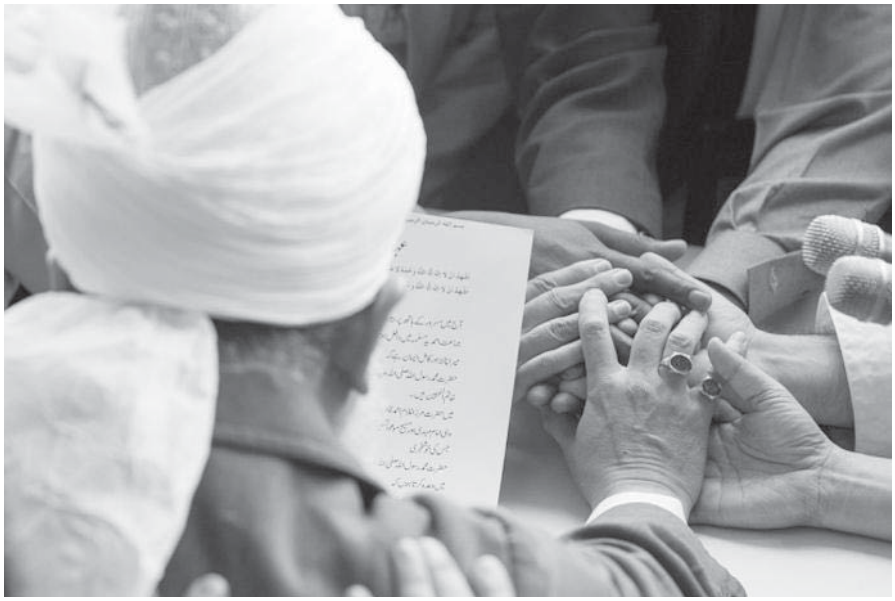

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(২য় কিস্তি)

বয়আতের প্রথম শর্ত

"বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।"

****

খোদা তা'লা শির্ক ক্ষমা করবেন না

আল্লাহ্ তা'লা 'সূরা নিসা'-র ৪৯ আয়াতে বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٩﴾

অনুবাদ: অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর কোন শরীক আছে মনে করে, এ ছাড়া সবকিছু তিনি ক্ষমা করে দেবেন যা তিনি চান। এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক আছে মনে করে নিশ্চয়ই সে বিরাট বড় পাপে নিপতিত হয়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

"এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেছেন **'ওয়া ইয়াগফিরু মাদুনা যালিকা... প্রগুক্ত'** অর্থাৎ প্রতিটি পাপের ক্ষমা হবে তবে শির্ক-কে খোদা ক্ষমা করবেন না। অতএব শির্ক এর কাছেও ঘেঁষবে না আর এটাকে লাঞ্ছনাদায়ী বৃক্ষ জানবে।" (তোহফায়ে গোলড়বীয়া হতে সংকলিত, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২৩-৩২৪এর টীকা)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"এখানে শির্ক বলতে কেবল এটা উদ্দেশ্য নয় যে শুধুই প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত প্রতিমাসমূহের আরাধনাকে শির্ক ভেবে নেয়া বরং এটাও এক শির্ক যখন বিশেষ উপায়-উপকরণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা হয় এবং দুনিয়ার হর্তা-কর্তাদের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়–এগুলোও শির্ক।" (আল হাকাম ৭ম খণ্ড, সংখ্যা নং ২৪, ৩০ জুন ১৯০৩, পৃষ্ঠা-১১)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আরও বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

অনুবাদ: আর যখন লুকমান তার পুত্রদের নসীহত করা কালে বলল যে 'হে আমার প্রিয় পুত্রগণ, আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীককে ভাবনায়ও আনবে না অবশ্য অবশ্যই শির্ক হলো বিরাট এক অন্যায়, ঘোর অন্ধকার'। (সূরা লোকমান, ৩১:১৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর নিজ উম্মতের মাঝে শিরকের আশঙ্কা ছিল। এক হাদীসে যেমন রয়েছে:

উবাদা বিন নসী আমাদেরকে শাদ্দাদ বিন আ'উস সম্পর্কে জানিয়েছে যে, সে কাঁদছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' এতে তিনি বললেন, 'আমার এমন এক বিষয় মনে পড়ে গেল যা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনোছি আর তাতেই আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শুনেছি তিনি (সা.) বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের মধ্যে শির্ক ও গোপন অভিলাষের ব্যাপার নিয়ে ভয় করছি'। বর্ণনাকারী বলছেন আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার উম্মত কি আপনার পর শিরকের পরীক্ষায় পতিত হবে'? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য আমার উম্মত, সূর্যের ও

চাঁদের বা বিভিন্ন মূর্তির বা প্রস্তর খণ্ড নির্মিত প্রতিমার পূজা তো করবে না তবে ধন-সম্পদে ও বিত্তে লোক দেখানো কাজ-কর্ম করবে এবং গোপন অভিলাষ চরিতার্থে লিপ্ত হবে। এদের মধ্যে কেউ রোযা রাখা অবস্থায় প্রভাতকাল এসে গেলে যদি বিশেষ কাম-ইচ্ছা জাগ্রত হয় তবে রোযা ভঙ্গ করে হলেও সে ওই অভিলাষ চরিতার্থে লিপ্ত হয়ে যাবে'। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৪ বৈরুত থেকে মূদ্রিত ও প্রকাশিত)

'শির্‌ক' এর প্রকারভেদ ও রকমফের

এ হাদীস থেকে যা প্রকাশ পেলো তা হলো যে, প্রকাশ্য শির্‌ক, বা মূর্তি-প্রতিমা বা চাঁদ সুরুজের আরাধনা যদি না-ও করা হয় তবুও লোক দেখানো কাজ-কর্ম; গোপন অভিলাষ বা অভিসন্ধি-র অনুগমন করাটাও শির্‌ক। যদি আজ্ঞাবহ একজন তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আনুগত্যের সীমা ছাড়িয়ে কেবলই তার আগে পিছে ছুটা-ছুটি করে তাকে তোয়াজ করতে থাকে এই ভেবে যে, তার হাতেই আমার রুটি-রুজির ব্যাপার ন্যস্ত, তাহলে এটাও এক ধরনের শির্‌ক। কারও যদি নিজ-পুত্রদের ব্যাপারে এই বলে গর্ব থাকে যে, আমার এতগুলো পুত্র সন্তান আছে আর এরা বড় হচ্ছে, এরা কাজে লেগে গেলে, বিস্তর কামাবে (রোজগার করবে), আমার দেখাশোনা করবে, বাকীটা জীবন আরাম-আয়েশে কাটাবো। আর আমার ওই যুবক ছেলেদের কারণে আমার ভাগী-শরীকরা আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সাহস করবে না। (উপমহাদেশে বরং সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ভাগী-শরীকদের মধ্যে খুবই মন্দ এ প্রথা চালু আছে।) পারিবারিক এই বন্ধনে পরিপূর্ণরূপে জড়িয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় পুত্ররা। আর যদি সেই পুত্র উত্তরাধিকার বিহীন হয় অথবা কোন দুর্ঘটনায় মারা যায় বা পঙ্গুত্ব বরণ করে তাহলে তো তার (সেই পিতার) সর্বংসহা-ই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

কেবল মুখে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলা এবং হৃদয়ে হাজার হাজার প্রতিমা জমা করার নাম তৌহীদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তার নিজ কাজ, ফন্দি, চালবাজি বা চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদার ন্যায় প্রধান্য দেয়, বা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখে, যা খোদার উপর রাখা উচিত, সে খোদা তা'লার কাছে পৌত্তলিকই। প্রতিমা শুধু তা-ই নয় যা সোনা, রূপা, পিতল বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং যার উপর ভরসা করা হয়; বরং প্রতিটি জিনিস বা কথা বা কাজ যাকে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়, যা খোদা তা'লার প্রাপ্য, সে সবই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিমা। ...মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত তৌহীদ, যার স্বীকৃতি খোদা আমাদের কাছে চান এবং যে স্বীকৃতির সাথে নাজাতের (মুক্তির) সম্বন্ধ রয়েছে তা এটাই যে, খোদা তা'লাকে মূর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজাত্মা, প্রবৃত্তি,কিংবা নিজস্ব চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ফন্দিফিকির ইত্যাদি সব রকমের অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র জ্ঞান করা। শক্তিধর কোন কিছুকেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সত্তা জ্ঞান না করা। কাউকেই অন্নদাতা স্বীকার না করা, কাউকেই 'মুইয্‌যু' (সম্মানদাতা) বা 'মুজিল্লু' (লাঞ্ছনাকারী) ধারণা না করা এবং কাউকেই নিরঙ্কুশ সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা। দ্বিতীয় কথা এটা যে, স্বীয় প্রেম একমাত্র তাঁকেই নিবেদন করা, ইবাদতকে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা, ভক্তিভরে একমাত্র তাঁর কাছে বিনয়াবনত হওয়া ও সকল আশা ভরসা একমাত্র তাঁরই উপর স্থাপন করা এবং শুধু তাঁকেই ভয় করা।

কোন তৌহীদ নিম্নোক্ত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ছাড়া পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ হতে পারে না।

প্রথমত: সত্তা হিসেবে তৌহীদ। তাঁর অস্তিত্বের সামনে যা কিছু আছে, সবই না থাকার মতই জ্ঞান করা এবং সে সবগুলোকে নশ্বর ও অসার মনে করা।

দ্বিতীয়ত: গুণের দিক হতে তৌহীদ। অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও ত্রাণ ইত্যাদি ঐশীগুণ, স্রষ্টার সত্তা ছাড়া কারও প্রতি আরোপ না করা এবং বাহ্যিকভাবে যারা কর্মকর্তা ও কল্যাণ সাধনকারী বলে দৃষ্টিগোচর হয়, তাদেরকে তাঁরই পরিচালনাধীন আজ্ঞাবহ বলে প্রত্যয় করা।

তৃতীয়ত: প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়ে তৌহীদ। অর্থাৎ উপাসনার আনুষ্ঠানিকতাতে অন্য কিছুকে খোদা তা'লার শরীক না করে তদুপরি তাঁর-ই মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ীকে চার সঁওয়ালোকা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯,২৫০)

পূর্বে এর সংক্ষিপ্ত কিছু ব্যাখ্যা আমি করে দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লাকে বাদ দিয়ে তাঁর কোন নামের সাথে, কোন কাজ-কর্মে বা গুণাবলীর সাথে, কোন ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা শির্‌ক। সকল ভাল কাজ-কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করুন এরই নাম হলো ইবাদত। মানুষ স্বীকার করে যে খোদা তা'লা ব্যতীত স্রষ্টা কেউই নাই। এটাও স্বীকার করে যে মৃত্যু ও জীবন খোদা তা'লারই হাতে, তাঁরই মুঠি-মধ্যে, তাঁরই শক্তি ও ক্ষমতায় ও তাঁরই আয়াত্ত্বাধীনে। এসব মান্য করা সত্ত্বেও অপরকে সেজদা করে, মিথ্যা বলতে থাকে আর সে সবেরই চারদিকে ঘুর ঘুর করে। পরম উপাস্যের আরাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকে। খোদা তা'লার জন্য রোযা রাখা বাদ দিয়ে অপরের জন্য উপোস দেয়। খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নামাযের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে গায়রুল্লাহ্'র নামায পড়ে আর এরই জন্য যাকাত দেয়। এসব ভ্রান্তিপূর্ণ অন্ধকার বিদূরিত করতে আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আবির্ভূত করেছেন। (খুতবাতে নূর, পৃ: ৭, ৮)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর ক্ষমার সুমহান দৃষ্টান্ত

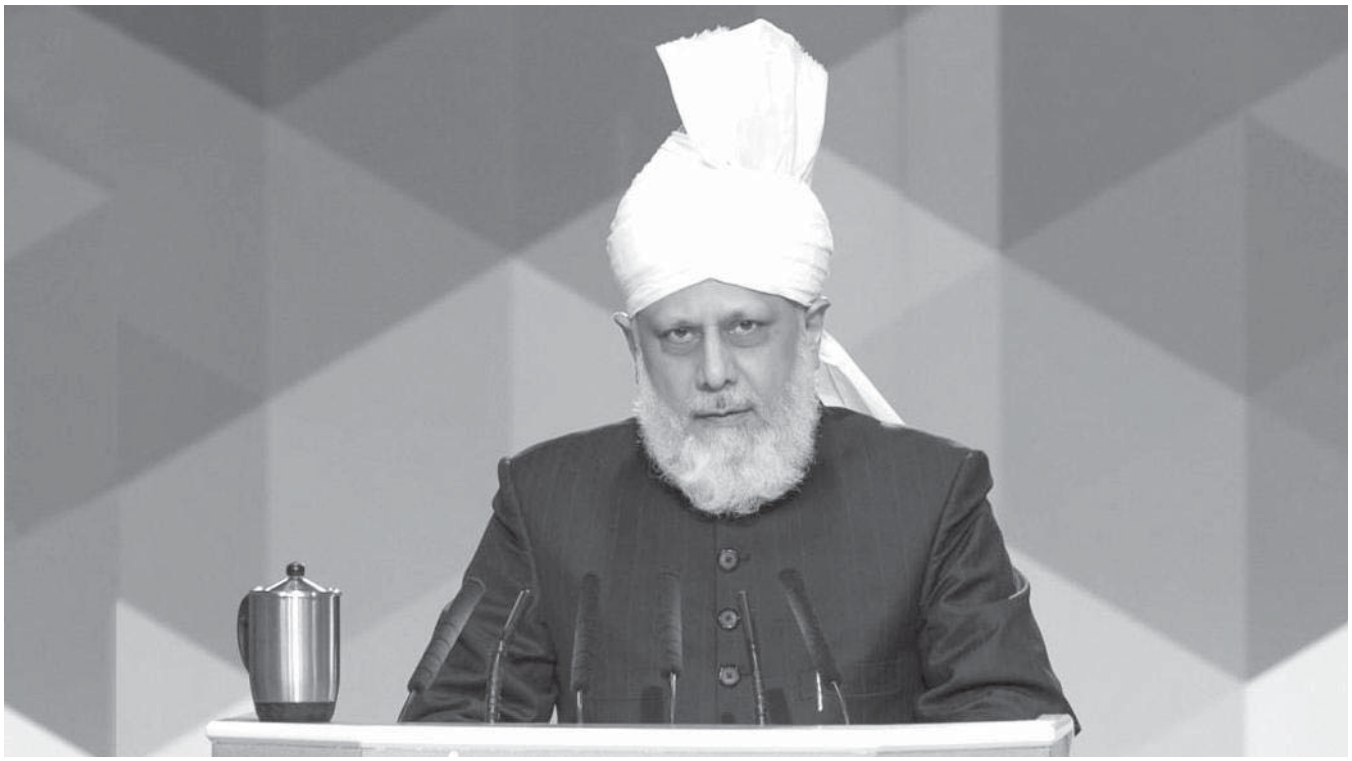

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অর্থ: আর অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় অনুপাতে হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শোধরানোর উদ্দেশ্যে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আশ্ শূরা: ৪১)

ইসলামী শিক্ষায় অপকর্মশীল বা ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাতে অন্তর্নিহিত থাকবে তার সংশোধনের দিক; তা সেই ক্ষতি স্বল্প পরিসরে হোক বা বৃহৎ পরিসরে বা সেই ক্ষতিসাধনকারী শত্রুই হোক না কেন। ইসলামে শাস্তির বিধান অবশ্যই রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি ক্ষমা এবং মার্জনার নির্দেশও রয়েছে। উক্ত আয়াতেও, আপনারা যা শুনেছেন, এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, মন্দকর্মশীল ব্যক্তি বা পাপীকে শাস্তি দাও কিন্তু এই শাস্তির পেছনে চালিকা শক্তি হওয়া উচিত সেই পাপাচারী বা ক্ষতিসাধনকারী এবং অপরাধীর সংশোধন। অতএব যেখানে সংশোধনই মূল উদ্দেশ্য সেখানে শাস্তি দেয়ার পূর্বে চিন্তা কর যে, শাস্তির দেওয়ার ফলে এই লক্ষ্য অর্জন হবে কিনা। এটি

চিন্তা করার পর এবং অপরাধীকে দেখার পর যদি এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যে, ক্ষমা করলেই এই অপরাধীর সংশোধন সম্ভব তাহলে ক্ষমা কর আর যদি মনে করো যে শাস্তি প্রদান করলে সংশোধনের সম্ভাবনা আছে তাহলে শাস্তি দাও। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ক্ষমা করা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবে।

আয়াতের শেষের দিকে 'ইন্নাহু লা ইউহেব্বুয যোয়ালেমিন' বলে একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সীমালঙ্ঘন কর তাহলে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাহোক পবিত্র কুরআনে শাস্তি এবং সংশোধনের এমন নীতি এবং আইন উপস্থাপিত হয়েছে যা আমাদের ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদিকে পুরোপুরী তুলে ধরে আর রাষ্ট্রীয় বরং আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও সামাজিক সংশোধনের এটিই ভিত্তি। আমি যেমনটি বলেছি, কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, তার সংশোধন এবং চারিত্রিক উন্নতি। অতএব ইসলামের শিক্ষা হলো, কেবল শাস্তির ওপর জোর না দিয়ে সংশোধনের ওপর জোর দাও। যদি মনে কর, ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তাহলে ক্ষমা কর। আর পরিস্থিতি এবং ঘটনা প্রবাহ যদি বলে যে, শাস্তি দিলে সংশোধন হবে তাহলে শাস্তি দাও। কিন্তু শাস্তি প্রদানে এ কথা অবশ্যই দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, শাস্তি অপরাধ অনুপাতে হওয়া উচিত, নতুবা কৃত অপরাধ থেকে যদি বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এটি অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন আর অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনকে খোদা তা'লা পছন্দ করেন না।

অতএব ইসলামে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মত বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য নেই। এর সুমহান দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়। তিনি যখন দেখেন যে, অপরাধী সংশোধিত হয়েছে বা তার সংশোধন হয়ে গেছে তখন চরম শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর ওপর, তাঁর সন্তান-সন্ততির ওপর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর হেন কোন অন্যায় বা অত্যাচার নেই যা করা হয়নি কিন্তু শত্রু যখন ক্ষমার প্রত্যাশী হলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের অঙ্গীকার করলো তখন তিনি (সা.) সবকিছু ভুলে গিয়ে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা থেকে হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর আদরের কন্যা হযরত যয়নবের ওপর এক পাষন্ড হাব্বার বিন আসাদ বর্শা দিয়ে প্রাণঘাতি আক্রমন করে। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সেই হামলার কারণে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং তার গর্ভপাত ঘটে। অবশেষে এই আঘাত তার জন্য প্রাণহারী প্রমাণিত হয়। এ কারণে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার রায় প্রদান করা হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই ব্যক্তি কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন হাব্বার মদিনায় তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, আপনার ভয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বড় বড় অপরাধ রয়েছে আর আপনি আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু আপনার দয়া এবং মার্জনার খবর আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। যদিও আপনি আমার বিরুদ্ধে শাস্তির রায় দিয়েছেন কিন্তু আপনার ক্ষমা এবং মার্জনা এত ব্যাপক যে, এরফলে আমার মাঝে এই সাহস সৃষ্টি হয়েছে আর আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা অজ্ঞতা এবং বহুশ্বরবাদে বা শিরকে নিমজ্জিত ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জাতিকে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছেন এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আমার সীমালঙ্ঘন এবং অপরাধ স্বীকার করছি, আপনি আমার অজ্ঞতা উপেক্ষা করুন। এতে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যার এই হন্তারককেও ক্ষমা করেন এবং বলেন, যাও হাব্বার তোমার ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয়েছে, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের এবং সত্যিকার তওবা বা অনুশোচনা করার তৌফিক দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন কবি যার নাম ছিল কা'ব বিন জহির। সে মুসলমান নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় কবিতা লিখতো, তাদের সম্ভ্রমে হামলা করতো। তার বিরুদ্ধেও শাস্তির সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছিল। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন কা'বের ভাই তাকে লিখেছে, মক্কার পতন ঘটেছে, তোমার জন্য ভালো হবে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। সে মদীনায় এসে পরিচিত এক ব্যক্তির ঘরে অবস্থান করে আর মসজিদে নববী-তে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায পড়ে। এরপর নিজের পরিচয় না দিয়েই সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কা'ব বিন জহির অনুশোচনার সাথে ফিরে এসেছে এবং ক্ষমা চাচ্ছে, যদি অনুমতি থাকে তাহলে তাকে আপনার সকাশে উপস্থিত করা যেতে পারে।

তিনি (সা.) যেহেতু তার চেহারা সম্পর্কে জানতেন না, তাকে চিনতেন না বা হতে পারে সে ব্যক্তি মুখ ঢেকে রেখেছিল যার ফলে অন্যান্য সাহাবীরাও চিনতে পারেনি; তাই তিনি (সা.) বলেন যে, হ্যাঁ সে আসতে পারে। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আমিই কা'ব বিন জহির। তখন এক আনসারী তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় কেননা; তার অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধেও মৃত্যুর দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) পরম স্নেহ পরবশ হয়ে বলেন, একে ছেড়ে দাও কেননা সে ক্ষমা প্রত্যাশী হয়ে এখানে এসেছে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর সন্নিধানে একটি কাসীদা বা কবিতার অর্ঘ্য পেশ করে। মহানবী (সা.) তাঁর এক দৃষ্টিনন্দন চাদর তখন পুরস্কারস্বরূপ তাকে উপহার দেন।

অতএব এই শত্রু, যার বিরুদ্ধে মৃত্যু দন্ডাদেশ জারী করা হয়েছিল, তাঁর দরবার থেকে শুধু প্রাণ ভিক্ষা নিয়েই ফিরেনি বরং পুরস্কার সহকারে ফিরে গিয়েছে। এমন আরো অনেক ঘটনা তাঁর (সা.) জীবনে দেখা যায় যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সংশোধনের পর তিনি (সা.) তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদেরও ক্ষমা করেছেন, তাঁর নিকটাত্মীয়ের যারা শত্রু ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদেরও ক্ষমা করেছেন। কিন্তু যেখানে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে শাস্তিও দিয়েছেন। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য হলো সংশোধন, প্রতিশোধ নেয়া নয়। হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা এবং বক্তৃতায় বেশ কয়েক স্থানে সূরা শূরার এই আয়াতের অর্থাৎ ৪১ নম্বর আয়াতেরব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রায় ১৩টি বইয়ে এর বরাতে আলোচনা দেখা যায়, এর চেয়েও বেশি হতে পারে। আর এই বইগুলোর ২১/২২টি জায়গায় এই বরাতে তিনি আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর অধিবেশন বা বিভিন্ন বৈঠকেও এ সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকে তিনি (আ.) শাস্তি ও পুরস্কারের দর্শন এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

(এই আয়াতের আলোকে) অন্যায়ের শাস্তি অন্যায় অনুপাতে হওয়া উচিত, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় ক্ষমা করে আর এমন ক্ষেত্রে করে যার ফলে সংশোধন হয়, কোন অপছন্দনীয় দিক সামনে না আসে অর্থাৎ মার্জনার যথাযথ স্থানে মার্জনা করে, অ-স্থানে নয়, তাহলে এমন ব্যক্তি এর প্রতিদান পাবে (অর্থাৎ ক্ষমাশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পুরস্কৃত হবে)।

তিনি (আ.) বলেন, এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়, কুরআনী শিক্ষা এমনটি নয় যে, কোন স্থানে অন্যায়ের মোকাবিলা করা যাবে না এবং দুস্কৃতকারী ও অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়া হবে না (যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয়) বরং কুরআনী শিক্ষা হলো এটি দেখা যে, সেই স্থান এবং কালটি অন্যায় ক্ষমা করার নাকি শাস্তি দেয়ার। তাই অপরাধীর পক্ষে এবং সাধারণ মানুষের জন্য যা কিছু সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। তিনি বলেন, অনেক সময় পাপ ক্ষমা করলে এক অপরাধী তওবা করে আর কোন কোন সময় অপরাধ ক্ষমা করার ফলে একজন অপরাধী আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, চোখ বন্ধ করে অন্ধের ন্যায় শুধু অন্যায় ক্ষমা করার অভ্যাস রপ্ত করো না। এটি নয় যে, আমরা শুধু (পাপ) ক্ষমাই করবো আর এটিই আমাদের একমাত্র কাজ, বরং সেই নির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা কর অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ্য সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, গভীর দৃষ্টিতে দেখ! সত্যিকার পুণ্য কোথায় নিহিত, ক্ষমার মাঝে নাকি শাস্তি দেয়ার মাঝে।

অতএব যে কাজ স্থানকাল ভেদে যুক্তিযুক্ত তাই কর। মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, যেভাবে কোন কোন মানুষ চরম প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে থাকে, এমনকি পিতা-পিতামহের যুগের প্রতিশোধের স্পৃহাও নিজেদের মাঝে লালন করে অনুরূপভাবে কোন কোন মানুষ মার্জনা এবং ক্ষমার ক্ষেত্রেও সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময় এই অভ্যাস এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, মানুষ আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে বসে। আর এমন লজ্জাস্কর মার্জনা এবং ক্ষমা তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় যা সত্যিকার অর্থে আত্মসম্মানবোধ, আত্মাভিমান এবং পবিত্রতা পরিপন্থী হয়ে থাকে আর তা নেক চাল-চলনকে কলুষিত করে। এমন ক্ষমা এবং মার্জনার ফলাফল যা হয়ে থাকে তাহলো, সবাই ছি ছি করে উঠে। এসব অপছন্দনীয় দিকসমূহের নিরিখেই পবিত্র কুরআনে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে স্থান ও কালের শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে আর এমন চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে পছন্দ করা হয়নি যা অযথা ও অস্থানে প্রকাশ পায়।

অতএব ইসলামী শাস্তির দর্শনে এটিই মূল কথা যে, দেখতে হবে পুণ্য কি-সে নিহিত এবং সংশোধন কীভাবে সম্ভব। অনেক সময় ক্ষমা করা পুণ্যে পর্যবসিত হয় কেননা এর ফলে সংশোধন হবে বা সংশোধন হয়, কিন্তু অনেক সময় তা পাপের কারণ হয়। কেননা এর ফলে অন্যায়কারী অন্যায়ে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠে। একইভাবে অনেক সময় শাস্তি প্রদানও পুণ্যে পর্যবসিত হয়। এটি সেই ব্যক্তির প্রতিও পুণ্য করার নামান্তর কেননা; শাস্তির মাধ্যমে তাকে পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় যেন সে নিজের পরবর্তী দিনগুলোকে পাপ থেকে বিরত থেকে ধ্বংস থেকে রেহাই পায় বা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। মহানবী (সা.) যাদের ক্ষমা করেছেন, যে দু'টো দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করেছি তাতে আমরা দেখতে পাই, তাদের মাঝে অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে। ইসলামের শত্রুরা অপকর্মশীল ছিল কিন্তু নিজেদের সংশোধনের পর তারাই সৎকর্মশীল হয়ে উঠে এবং ইসলামের সেবকে পরিণত হয়। অতএব ইসলাম এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম যা সকল যুগে স্বীয় শিক্ষার গুরুত্ব দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরাধীর পক্ষে যা কল্যাণকর তাই কর।

আজকাল যারা মানবাধিকারের ধ্বজাধারী সাজে তারা একপেশে নীতি অনুসরণ করছে। কারো অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন মানবিক সহমর্মিতার নামে এসব অপরাধীদেরও এতটা ধৃষ্ট করে তোলা হয় যে, অনেক অপরাধীর হৃদয় থেকে তারা যে অপরাধ করছে সেই চেতনাই লোপ পেয়েছে। তারা হন্তারক হয়ে উঠেছে, পেশাদার খুনীতে পরিণত হয়েছে এবং অহংকারে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, নিজেদের জীবন ছাড়া আর কারো জীবনের কোন গুরুত্বই আছে বলে তারা মনেই করে না। এমন লোকদের শাস্তি মৃত্যুদন্ডই দেওয়া উচিত, তবে হ্যাঁ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু পাশ্চাত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবাধিকারের নামে এই শাস্তি প্রদান করা হয় না। বিভিন্ন দেশ তাদের সংবিধান পরিবর্তন করে এই শাস্তির বিধানকেই মুছে ফেলেছে যেখানে কিনা এমন লোকদের সংশোধনও দৃষ্টিগোচর হয় না আর তারা যুলুম এবং অন্যায়েও সীমা লঙ্ঘন করে। অথবা দ্বিতীয় প্রকার সীমা লঙ্ঘন চোখে পড়ে। যেমন মুসলমান দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ আন্দোলন করে তাদেরকে সিংহাসনচ্যুত করেছে বা ক্ষমতাচ্যুত করেছে আর এরপর তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে যদি শাস্তি পাওয়ার থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের হাতে তাদেরকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর স্থানীয় জনসাধারণ যখন তাদের নেতাদের ওপর যুলুম করে তখন আসলে এর পিছনে কতিপয় পরাশক্তির প্ররোচনা থাকে যার ওপর ভিত্তি করেই এসব কিছু করা হয়।

ইসলাম সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য প্রদর্শনে বারণ করে। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে শাস্তির কথা বলেছেন সেখানে ধনী-দরিদ্র সবার সাথে সমান

ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঠিক ততটাই শাস্তি দাও যতটা অপরাধ করেছে এবং শাস্তি প্রদানের কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ কর। আর আমরা দেখতে পাই, মদিনায় শাসনকালে মহানবী (সা.) এবং তাঁর পর খলীফারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেখিয়েছেন, কীভাবে শাস্তি দেয়া উচিত আর শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যই বা কী।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কেবল এটি দেখলেই চলবে না যে, অপরাধীর জন্য কী কল্যাণকর। অর্থাৎ শুধু অপরাধীর দিকে দেখলেই চলবে না, অনেক সময় এটিও দেখতে হয় যে, সমাজের জন্য কী কল্যাণকর। অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে তুচ্ছ বিষয়কে উপেক্ষা করা বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই যে কোন শাস্তির সিদ্ধান্তের সময় এটি দেখা আবশ্যক যে, সামগ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের ওপর কী প্রভাব পড়ছে।

অনেক সময় ক্ষমা করা সমাজে ভ্রান্ত মনোবৃত্তির জন্ম দিয়ে থাকে! যেমন মানুষ বলে যে দেখ কত বড় অপরাধী! অথচ এই অন্যায় কাজ করেও পার পেয়ে গেছে। দুস্কৃতকারী মানুষ তখন মনে করে, আমরাও অন্যায় করে এরপর ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাব। এই পরিস্থিতি এক পর্যায়ে অপরাধীকে অপকর্মে ধৃষ্ট করে এবং তার হাতকে শক্তিশালী করে। একইভাবে এর ফলে ভদ্র মানুষের মনে ভীতি দানা বাঁধে বা মোটের ওপর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে আর তখন তারা এই উৎকণ্ঠা দূর করার কৌশল সন্ধান করে। যদি এমন আইনহীনতা বিরাজ করে তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিঃসন্দেহে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নিয়ে থাকে কিন্তু এমন আইনহীনতা না হলেও যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে তাহলে কিছু মানুষ আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দৃষ্টিনন্দন ইসলামী শিক্ষা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলমান দেশে এই পরিস্থিতিই আমাদের চোখে পড়ে। শাস্তি এবং ক্ষমার অসম প্রয়োগ ও অন্যায় আচরণ অপরাধী সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে আর এর ফলে অন্যরাও একই আচরণ আরম্ভ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শাস্তি দেয়া এবং ক্ষমার ক্ষেত্রে একটি অনেক বড় বিষয় দৃষ্টিতে রাখা চাই আর তাহলো, সমাজ এই শাস্তি এবং ক্ষমার কি প্রভাব গ্রহণ করছে? যদি ক্ষমা মানুষকে ধৃষ্ট করে তোলে তাহলে ক্ষমা নয় বরং শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার তওরাত এবং ইঞ্জিলের সাথে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে বলেন,

ইঞ্জিলে লেখা আছে, তুমি অন্যায়ের প্রতিউত্তর দিবে না। অর্থাৎ ইঞ্জিলে লেখা আছে যে, তুমি অন্যায়ের মোকাবিলা করো না। এক কথায় ইঞ্জিলের শিক্ষা শিথীলতাপ্রবণ। বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছাড়া মানুষ এটি গ্রহণই করতে পারে না। পক্ষান্তরে তওরাতের শিক্ষার প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে এতে বাড়াবাড়ির প্রবণতা দেখা যায়। তাতে শুধু একটি কথার ওপরই জোর দেয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে যেন দাঁত ফেলে দেয়া হয়। এতে মার্জনা এবং ক্ষমার নাম চিহ্নও দেখা যায় না। আসল কথা হলো, এই সব গ্রন্থ বিশেষ জাতি এবং বিশেষ যুগের জন্য ছিল। কিন্তু কুরআন আমাদের কতই না পবিত্র পথের দিশা দিয়েছে যা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য হতে মুক্ত এবং একান্তভাবে মানবপ্রকৃতি সম্মত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۱﴾

(সূরা আশ্ শূরা: ৪১)

অর্থাৎ যতটা অন্যায় করা হয়েছে ততটাই শাস্তি দেয়া বৈধ। কিন্তু কেউ যদি মার্জনা করে আর এই মার্জনার মূল উদ্দেশ্য হয় সংশোধন হয়ে থাকে, অযথা এবং অস্থানে যদি মার্জনা প্রদর্শিত না হয় বরং যথাস্থানে প্রদর্শিত হয় তাহলে এমন মার্জনাকারীর জন্য প্রতিদান রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে সে পাবে। অতএব দেখ! কত পবিত্র শিক্ষা এটি, কোন বাড়াবাড়িও নেই আর শৈথিল্যও নেই। এতে প্রতিশোধের অনুমতি আছে কিন্তু একই সাথে ক্ষমার প্রেরণাও যুগিয়েছে অর্থাৎ তোমরা এর ফলে পুরস্কৃত হবে, শর্ত হলো সংশোধন। এটি একটি তৃতীয় রাস্তা বা পথ যা কুরআন পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছে। এখন একজন সুস্থ প্রকৃতির মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, এগুলোর মাঝে তুলনা করে দেখা যে, কোন শিক্ষা মানব-প্রকৃতি-সম্মত আর কোন শিক্ষা এমন যাকে কোন সুস্থ প্রকৃতি এবং মানুষের বিবেক ঘৃণা করে।

অতএব ইসলামী শিক্ষাই এমন শিক্ষা যা সকল যুগে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান দেয় তা শাস্তি সংক্রান্ত হোক বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্তই হোক না কেন। ইসলাম বলে, একবার ক্ষমা করলে হিংসা, বিদ্বেষ আর প্রতিশোধ-প্রবণতা মন থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, অনেকের হৃদয়ে এত বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধ-প্রবণতা থাকে যে, পিতা-পিতামহের যুগের কথাও তারা স্মরণ রাখে- ক্ষমা করে না। তিনি বলেন, হৃদয়ে বিদ্বেষ বা প্রতিশোধ লালন করা মু'মিনের সাজে না। মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ দেখুন, উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর লাশের অঙ্গচ্ছেদ করে, নাক, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে সেই লাশ বা মরদেহ বিকৃত করেছে, তার কলিজা বের করে তা চিবিয়েছে। এক কথায় সে অত্যাচার ও বর্বরতায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে এতসব কিছু সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ দেখুন! মক্কা বিজয়ের সময় হিন্দা মুখ ঢেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈঠকে এসে উপস্থিত হয়, প্রকাশ্যে আসা সম্ভব ছিল না কেননা; তার এই অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধেও মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁর (সা.) বৈঠকে এসে সে বয়আত করে, ইসলাম গ্রহণ করে এবং মহানবী (সা.)-কে কিছু প্রশ্ন করে। মহানবী (সা.) তার কণ্ঠস্বর শুনেচিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা? সে বলে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল এখন আমি আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়ে গেছি, পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য

মার্জনা করুন। তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করেন আর এই ক্ষমার তার ওপর এমন সুগভীর প্রভাব পড়ে যে, তার অবস্থাই পাল্টে যায়। সে ঘরে গিয়ে মহানবী (সা.)-কে নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খাবার প্রস্তুত করে এবং দু'টো ভুনা করা বকরা বা খাসি পাঠিয়ে দেয় এবং বলে, আজকাল বকরা বা খাসির স্বল্পতা রয়েছে তাই এই সামান্য উপহার গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! হিন্দার মেষপালে বরকত দাও। এর ফলশ্রুতিতে তার মেষ বা ছাগপাল এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, তার জন্য তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একটি শ্রেণী এমন যারা ক্ষমা করতে জানেই না, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পিতা-পিতামহের যুগের মনোমালিন্যকেও তারা হৃদয়ে পুষে রাখে। অপর দিকে এমন আত্মাভিমানহীন ও নির্লজ্জ মানুষও রয়েছে, নেক জীবনের জন্য তারা এক প্রকার কলঙ্ক আর ক্ষমার নামে তারা লজ্জাবোধ বিবর্জিত আচরণ করে। অতএব আত্মাভিমানহীন হওয়াও উচিত নয় আর অন্যায়ও করা উচিত নয়। কেউ যদি কারো কন্যা বা বোনের সম্মানের ওপর আঘাতহানে বা সম্ভ্রমের ওপর হামলা করে তাহলে আইনের গন্ডিতে থেকে অবশ্যই তার ব্যবস্থা নেয়া উচিত, ক্ষমার প্রশ্নই উঠে না। তাই ক্ষমা এবং আত্মমর্যাদাহীনতার মাঝে পার্থক্য জানার চেষ্টা থাকা চাই, কিন্তু কোনভাবেই আইন হাতে তুলে নিবেন না, এটি আবশ্যকীয় শর্ত।

আমি যেমনটি বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক জায়গায় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করেছেন। আমি আরো কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। বাহ্যতঃ উদ্ধৃতি দেখে মনে হয়, একই বিষয় বার বার চোখের সামনে আসছে, কিন্তু তিনি সর্বত্র এই প্রেক্ষাপটে যা বলেছেন তাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সদুপদেশ রয়েছে।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, অন্যায়ের শাস্তি অন্যায় অনুপাতেই হওয়া উচিত কিন্তু যে ব্যক্তি মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে আর সেই মার্জনার ফলে যদি সংশোধন হয়, ক্ষমা পাপে পর্যবসিত না হয়; তাহলে খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর তাকে তিনি এর প্রতিদান দিবেন। অতএব কুরআন অনুসারে সব স্থানে প্রতিশোধ নেয়াও প্রশংসনীয় নয় আর সব জায়গায় মার্জনাও প্রশংসনীয় নয় বরং স্থান-কাল ভেদে তা হওয়া উচিত। প্রতিশোধ এবং মার্জনার আচরণ স্থান-কাল ভেদে হওয়া উচিত, লাগামহীন ভাবে নয়; আর এটিই কুরআনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হন যার উদ্দেশ্য পুত-পবিত্র এবং যার উদ্দেশ্য হলো সংশোধন। নির্লজ্জ বা আত্মাভিমানহীন ব্যক্তির ক্ষমাতে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। আর তিনি তার প্রতিও সন্তুষ্ট নন যার উদ্দেশ্য কেবল শুধু প্রতিশোধ নেয়া। এই উভয় বিষয়কে দৃষ্টিতে রাখা চাই, এতটা নির্লজ্জ হওয়া উচিত নয় যা আত্মাভিমানহীনতায় পর্যবসিত হতে পারে। এমনটি করলেও আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না আর কেবল প্রতিশোধের মন-মানসিকতাও থাকা উচিত নয় কেননা; তা খোদাকে অসন্তুষ্ট করে। তাই এই উভয় সীমা সামনে রেখে ক্ষমা এবং শাস্তির সিদ্ধান্ত করা উচিত। এ সম্পর্কে জামাতের ওহদাদার (পদাধিকারী) ও ব্যবস্থাপনাকে দৃষ্টি রাখা চাই; সচরাচর খেয়াল রাখা হয়। কতিপয় লোকের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত হয় বা আমার কাছে যে সুপারিশ আসে আমি এটি বলবো না যে, প্রতিশোধ-প্রবণতার কারণে এমনটি হয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময় অবশ্যই যা ঘটে তাহলো সুপারিশকারীর সহজাত প্রবণতা থেকে থাকে কঠোরতার দিকে আর অনেকেই অপ্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং মার্জনার প্রবণতা রাখে, যার ফলে অনেক অপছন্দনীয় বিষয় সামনে আসে, তাই (সর্বত্র) শাস্তি দেয়াও পছন্দনীয় নয় আর ক্ষমা করাও প্রশংসনীয় বিষয় নয়।

আসল বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। এটি তখন লাভ হয় যখন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সংশোধন আর এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর, তা উমুরে আমা হোক বা কাযা বা বিচার বিভাগই হোক না কেন তাদের উচিত বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত করা যেন সেই সঠিক ব্যবস্থা এবং সেই প্রকৃত পরিস্থিতি পরিবেশ আমরা জামাতের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি যা খোদার সন্তুষ্টিতে পর্যবসিত হবে আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়াও করা উচিত এবং সাহায্যও চাওয়া উচিত। যখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা দোয়ার ভিত্তিতে হওয়া উচিত, এরপর খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে সুপারিশ করা উচিত যেন সকল ক্ষতিকর দিক থেকে সেই ব্যক্তিও নিরাপদ থাকে যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বা অভিযোগ করা হচ্ছে। অপরদিকে জামাতের ব্যবস্থাপনাও যেন সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকে অধিকন্তু জামাতের কোন সিদ্ধান্ত যেন অশান্তির কারণ না হয়।

অনুরূপভাবে আরেক জায়গায় স্বীয় গ্রন্থ 'নাসীমে দাওয়াত'-এ এই বিষয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের এবং অমুসলমানদের ইসলামের এই অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার জ্ঞান থাকা উচিত। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, এটি একটি এমন সুন্দর শিক্ষা যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না।

তিনি (আ.) বলেন, কেউ যদি তোমাকে কষ্ট দেয়, যেমন দাঁত ফেলে দেয় বা চোখ নষ্ট করে তাহলে তার শাস্তি ততটুকুই যতটা সে অপরাধ করেছে, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে যদি পাপ ক্ষমা কর আর এর ফলে কোন ভালো ফলাফল প্রকাশ পায় এবং তার সংশোধন হয়ে যায় অর্থাৎ অপরাধী যদি ভবিষ্যতে এই অভ্যাস থেকে বিরত থাকে এবং অপরাধীর সংশোধন হয়ে যায় তাহলে এমন ক্ষেত্রে ক্ষমা করাই শ্রেয় আর এই ক্ষমার ফলে ক্ষমাকারী আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রতিদান পাবে।

দেখ! এই আয়াতে উভয় দিক দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে আর মার্জনা ও প্রতিশোধ উভয়টিকে সময়ের দাবির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সময়ের দাবি হলো, স্থান-কাল ভেদে কাজ হওয়া উচিত আর এটিই প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা যার ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যবস্থা কাজ করছে। স্থান-কাল ভেদে কঠোর ও কোমল উভয় ব্যবহার করাই বুদ্ধিমত্তার

পরিচায়ক। তোমরা দেখ, আমরা একই প্রকার খাবারের ওপর সব সময় জোর দিতে পারি না বরং সময়ের দাবি অনুসারে খাবারে পরিবর্তন আসতে থাকে। গরমকালে আমরা ভিন্ন জিনিস পছন্দ করি আর শীতকালে অন্য রকম সুষম খাবারের কথা বলা হয়ে থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতির যে নীতি আছে তা এ ক্ষেত্রেও কাজে আসা উচিত। শীত এবং গরমে কাপড়ও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন হতে থাকে। একইভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের দাবি রাখে। যেভাবে আমাদের খোরাক পরিবর্তিত হয়, আর খোরাকও আবহাওয়া অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে গ্রীষ্মে এবং শীতের ঋতুতে কাপড়ও পরিবর্তিত হয়। এসব কিছু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন চায়।

পোশাক সম্পর্কে আমি কথা প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই, এখানে মানুষ গ্রীষ্মে পোশাকের দিক থেকে উলঙ্গ হয়ে যায়, বিশেষ করে মহিলারা। শীতকালে স্কার্ফ বা মাফলার আর কোর্ট দিয়ে(নিজেদের) আবৃত করে রাখে আর এটি যথাযথ পোশাক হয়ে থাকে। একই পোশাক অর্থাৎ শীতকালে এরা যেমন পোশাক পরে তা যদি মুসলমান মহিলারা, হিজাব পরিধানকারিনী মহিলারা পরিধান করে আর তারা গ্রীষ্মকালে মাথা ঢাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। বলা হয়, এভাবে নারীর অধিকার খর্ব হচ্ছে। সরকার এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নাক গলানো আরম্ভ করে। এটি এক প্রকার হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোই যার উদ্দেশ্য, সংশোধন নয় বরং এটি অন্যায়। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী সাহেবের বিবৃতি এসেছে, "আমরা ভাবছি, যেসব মহিলা পাবলিক স্থানে পর্দা করে বা চাকুরীজীবি মহিলারা যদি পর্দা করে আসে তাহলে তাদেরকে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হবে।" এই জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে তারা আরেকটি কঠোর পন্থা অনুসরণ করছে যার ফলাফল হয়ে থাকে নৈরাজ্য ও অসন্তোষ । ইসলাম বলে, এমন আইন প্রনয়ন করো না বা এমন সিদ্ধান্ত করো না যার ফলে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বরং সেই সিদ্ধান্ত কর যা সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং সেই ব্যক্তির জন্যও কল্যাণকর। এমন সিদ্ধান্ত যদি হয় তাহলে এর ফলে আল্লাহ্ তা'লাও সন্তুষ্ট হবেন। যাহোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

একইভাবে আমাদের নৈতিক অবস্থাও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন চায়। একটি সময় হয়ে থাকে প্রতাপ দেখানোর বা কঠোরতার, সেখানে নমনীয়তা ও মার্জনার ফলে অশান্তি দেখা দেয় দ্বিতীয় স্থানটি হয়ে থাকে নমনীয়তা এবং বিনয়ের, সেখানে ক্রোধ ও প্রতাপ প্রদর্শন ইতরতা গণ্য হয়। এক কথায় স্থান ও কাল একটি বিশেষ বিষয়ের দাবি রাখে, যে ব্যক্তি সময়ের দাবিকে উপক্ষো করে সে মানুষ নয় বরং পশু, সভ্য নয় বরং বন্য।

স্থান-কাল ভেদে আর সময়ের দাবি অনুসারে কাজ করার জন্য প্রকৃতির নিময় থেকে তিনি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যেমনটি আমি বর্ণনা করলাম। খাবার সুষম হওয়া প্রয়োজন, মানুষ এক প্রকার খাবার সর্বদা খায় না। আজকালও যেসব পুষ্টি বিষারদ রয়েছে তারা তাদের রোগীদেরকে বড় বড় তালিকা বানিয়ে দেয় যে, এই অনুসারে খাবার খাও আর খাবারের মাধ্যমেই চিকিৎসা হয়। অনুরূপভাবে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হয়ে থাকে আবহাওয়ার দাবী অনুসারে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন নৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি (আ.) বলেন, কোন স্থানে নমনীয়তা ও মার্জনার ফলে বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর কোন ক্ষেত্রে কঠোরতা ও দাপট দেখালে বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়।

অতএব মানব প্রকৃতির এই দিকটিকে সর্বত্র বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে, অর্থাৎ পরিবর্তন যেন তার প্রকৃতি সম্মত হয়। সংশোধনের জন্য যা কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে, তা যেন মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয়ে থাকে আর এটিই মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন অযথা মার্জনা ও ক্ষমাকে বৈধ আখ্যায়ীত করেনি । এর ফলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয় আর ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, বরং সেই মার্জনার অনুমতি দিয়েছেন যার ফলে বা যার মাধ্যমে কোন প্রকার সংশোধন সম্ভব।

অতএব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, মার্জনা এবং ক্ষমা যদি বিনা কারণে এবং অযথা হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ে আর মানুষের মাঝে লাগামহীনতা দেখা দেয়, মানুষ সীমা ছাড়িয়ে যায়, সিষ্টেম আর বাকী থাকে না। অতএব যারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি পায়, তাদের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এই কথার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, আমরা কীভাবে আত্মসংশোধন করতে পারি, এর জন্য ইস্তেগফার করা উচিত, আত্মসংশোধন করা উচিত। প্রতিশোধের মন মানসিকতা নিয়ে জামাত কাউকে শাস্তি দেয় না, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, সংশোধনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি দেয়া হয়। আর এই চেষ্টাই হওয়া উচিত আর এমনই হয়ে থাকে। কেবল পদাধিকারীদেরই দোষ নয় বা কেবল তারাই দায়ী নয় বরং সাধারণ সদস্যদেরও অপরাধ বা দোষ থেকে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন জীবনে বা পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে আত্মজিজ্ঞাসা করে যে, অন্যদের সম্পর্কে তার চিন্তাধারা কেমন, আর নিজেকে সে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাহলে এর ফলে সমাজে এক প্রকার সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

তাই আসল বিষয় হলো, প্রতিটি কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত, এদিকে সদা দৃষ্টি থাকা চাই । এটি যদি হয়, কেবল তবেই সংশোধন হবে। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

পাপের শাস্তি পাপ অনুসারে বা পাপ অনুপাতে দেওয়া উচিত কিন্তু কেউ যদি মার্জনা করে সেই মার্জনা যেন অযথা না হয়; বরং এর উদ্দেশ্য সংশোধন হওয়া উচিত। এমন ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার হাতে। যেমন চোরকে যদি ছেড়ে

দেয়া হয় সে ধৃষ্টতার সাথে ডাকাতি করবে, কাজেই তাকে শাস্তিই দেয়া উচিত। কিন্তু যদি দু'জন চাকরের একজন এমন হয় যে একটু চোখ রাঙ্গানিতেই লজ্জিত হয়, তার অন্যায় কাজকে রক্তিম চোখে দেখলে এতে সে লজ্জিত হয় এবং তা তার সংশোধনের কারণ হয়, এমন ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। অনেকে ইঙ্গিতেই বিষয় বুঝে যায়, তাদের কিছু বলতেই হয় না, তাদের দিকে তাকালেই তাদের সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় জন যে কিনা জেনেশুনেই দুষ্কৃতির আশ্রয় নেয় তাকে মার্জনা করলে সে নষ্ট হয়, তাকে শাস্তি দেয়াই যুক্তিযুক্ত। এখন বল! যুক্তিযুক্ত নির্দেশ কি সেটি যা কুরআন দিয়েছে, নাকি সেটি যা ইঞ্জিল উপস্থাপন করে? প্রকৃতির নিয়ম কি চায়? তা স্থান-কালের নিরিখে সিদ্ধান্ত করার শিক্ষা দেয়। সংশোধনের মাধ্যমে মার্জনার শিক্ষা এমন উন্নত শিক্ষা যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। শুসভ্য মানুষকে এটিই অনুসরণ করতে হয় আর এই শিক্ষা অনুসরণ করলে মানুষের মাঝে উদ্ভাবনী শক্তি এবং অন্তদৃষ্টি প্রখর হয়। এক কথায় যেন এটি বলা হয়েছে, সকল স্বাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে দেখ আর অন্তঃদৃষ্টির ভিত্তিতে চিন্তা কর।

বলা হয়, ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং মানুষকে বাধাগ্রস্ত করে। তিনি (আ.) বলেন, এই একটি নির্দেশকেই দেখ এবং ভাব, এর ফলে কীভাবে অন্তঃদৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি (আ.) বলেন, মার্জনার ফলে যদি উপকার হয় তাহলে মার্জনা কর কিন্তু যদি কেউ নোংরা আর দুষ্কৃতকারী হয়ে থাকে তাহলে "জাযাউ সাইয়েআতিন সাইয়েআতুম মিসলুহা" অনুশাসন মেনে চল, ইসলামের অন্যান্য পবিত্র শিক্ষাও এমনই যা সকল যুগে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

অতএব এ দু'টো কথা আমাদের সব সময় দৃষ্টিতে রাখা উচিত কননা আমাদের সংশোধন করতে হবে, পাপ দূরীভূত করতে হবে, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে হবে। কেননা তিনি যালেম বা অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কুরআনী শিক্ষা অনুধাবন করা এবং সেই অনুসারে জীবন যাপনের তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা রাবওয়ার জনাব বেলাল মাহমুদ সাহেবের, পিতার নাম হলো মমতাজ মাহমুদ সিদ্ধী। মরহুম রাবওয়ার দারুল ইয়ামান গারবির অধিবাসী। বেলাল মাহমুদ সাহেবকে ২০১৬ সনের ১১ই জানুয়ারী রাতের বেলা রাবওয়াতে শহীদ করা হয়েছে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি রাতের বেলা ঘরে ফিরছিলেন। অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী গুলী করে তাকে হত্যা করে। ঘটনার বিবরণ হলো, রাবওয়ার রেল ফটকস্থ বেলাল মার্কেটের দোকান থেকে তিনি ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাবোয়ার গিরির নিকটবর্তী স্থানে অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহীরা গুলী করে পালিয়ে যায়। তার গায়ে ৫টি বুলেট বিদ্ধ হয় এরমধ্যে, দু'টো মাথায় আঘাত করে। এরপর তাকে ফযলে ওমর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ফয়সালাবাদের এলাইড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে অপারেশনের উদ্দেশ্য ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার অপেক্ষায় থাকে কিন্তু বুলেট বের করার জন্য অস্ত্রোপচারের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

১৯৮৯ সনে মিরপুর খাস জেলার নওকোর্টের গোঠ বেলাল নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ওয়াক্‌ফে নও-এর বরকতময় তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। ২০০৩ সনে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি এবং তার পরিবার রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। তিনি ২০০৮ সনে ওয়াক্‌ফ নবায়ন করে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ওসীয়্যত দপ্তরে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত জামাতের কাজ করেছেন। তার ছোট্ট একটি দোকান ছিল, সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য সেই দোকানে যেতেন। নিজ হালকায় বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামাতের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আজকাল তিনি পাড়ার সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করছিলেন। ২০১৫ সনের এপ্রিল মাসে মরহুম বিয়ে করেন। তার স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে কৃপাবারিতে সিক্ত করুন এবং অনাগত সন্তানের ওপরও করুণাবারি বর্ষণ করুন। খুবই ভদ্র, সহানুভূতিশীল, মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কাজের প্রতি আন্তরিক, পরিশ্রমী এবং আনুগত্যশীল ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভদ্রতা ও ভালোবাসার সাথে আচরণ করতেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, মা এবং বোনদের সাথে গভীর স্নেহের সম্পর্ক রাখতেন।

তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মুবাশ্বেরা বেলাল সাহেবা, মা মুবারেকা মমতাজ সাহেবা, এছাড়া এক ভাই এবং দু'বোন রেখে গেছেন। পূর্বের এবং বর্তমান সেক্রেটারী মজলিসে কারপরদায উভয়ই এই কথা লিখেছেন, মরহুম খুবই কুশলী এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। কখনও কোন সময় আলস্য প্রদর্শন করেছেন এমনটি হয়নি, সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকতো। যথা সময় অফিসে আসতেন, যে কাজের জন্যই বলা হতো ছুটে গিয়ে করতেন। এমন কর্মী কমই পাওয়া যায় যারা সব সময় হাসি মুখে কাজ করে। সব সময় নিজের কাজের ধ্যানে থাকতেন, আনুগত্যের ক্ষেত্রে বড় উন্নত পর্যায়ের ছিলেন। জামাতী কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। বর্তমান সেক্রেটারী কারপরদায নাসীর সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে শহীদের এমন সম্পর্ক ছিল যা দেখে ঈর্ষা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবোল দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪৭)

কয়েকজন মিথ্যা দাবিকারকের দৃষ্টান্ত

* আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গ-রাষ্ট্রের 'জিয়ন' নামক স্থান থেকে আলেক-জান্ডার ডুই নামক এক ব্যক্তি যীশুর পূর্বসূরী হিসেবে আগমনকারী তথা 'এলিজা' হওয়ার দাবি করে। ঐ দাবীকারী এক পর্যায়ে ভারতে কাদীয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবিকারী- মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)- এর সঙ্গে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিতর্ক এবং মোবাহালার চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়। পরিনামে চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী ডুই অপদস্থ এবং শোচনীয় অপমানজনক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে (মার্চ ৪,১৯০৪ ইং)। আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় উক্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সম্প্রচারিত হয়। সেগুলোর মধ্য থেকে তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ বিশেষ নিম্নরূপঃ

–"The Qadian man predicted that if Dowie accepted the challenge, 'he shall leave the world before my eyes with great sorrow and torment.' If Dowie declined, the Mirza said, 'the end would only be deferred; death awaited him just the same, and calamity will soon overtake Zion. 'That was a grand prophecy: Zion should fall and Dowie die before Ahmad. It appeared to be a risky step for the Promised Messiah to defy the restored Elijah to an endurance test, for the challenger was by 15 years the older man of the two and probabilities in a land of plagues and famines work against him as a survivor, but he won out." (Truth Seeker, June 15, 1904)

–"Ahmad and his adherents may be pardoned for taking some credit for the accuracy with which the prophecy was fulfilled a few months ago." (*Danville Gazette, June 7, 1904)*

–"Dowie died with his friends fallen away from him and his fortune dwindled. He suffered from paralysis and insanity. He died a miserable death, with Zion city torn and frayed by internal dissensions. Mirza comes forward frankly and states that he has won his challenge." (Boston Herald, June 23, 1904)

These quotations from the American newspapers show that the prophecy made an impression not only on Christians but also on free-thinking editors of the American newspapers. They had been so impressed by the grandeur of the prophecy that they felt obliged to write about it. They were not able to deny its truth or its importance. Whenever the Sign of the death of Dowie is narrated before Western audiences, they will have before them the testimony of scores of newspapers, edited by fellow-countrymen and fellow-believers. [৩৯]

* ১৮২০ সনে যোসেফ স্মীথ নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্ক থেকে নতুন ধর্ম-শাস্ত্র 'The Book of Mormon' প্রাপ্তির দাবী করে। তার অনুসারীরা Later Day Saints হিসেবে বা Mormon হিসেবে পরিচিত।

* ১৮৬৩ সনে ইরানের মির্যা হোসেন আলী নুরী নিজেকে বাহাউল্লাহ (খোদাতালার বিকাশ-স্থল) হওয়ার দাবী করে। পরে প্যালেন্টাইনে অবস্থান কালে ১৮৯২ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

* ১৯০২ সনে লন্ডন থেকে ধর্ম-যাজক রেভারেন্ড জন হুগ পিগট ঘোষনা করেন যে তিনিই মসীহ (খোদার পুত্র) এবং তিনিই খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আকাশ থেকে অবতীর্ন হয়েছেন। তার এই দাবীকে আহমদীয়া জামাতের নেতার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মি.পিগট এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহস পায় নাই। পরিশেষে নানা কেলেংকারীর কারনে তাকে গীর্জার যাজকের দায়ীত্ব থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এভাবেই পরিশেষে তার অপমানজনক এবং গযবপ্রাপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রকৃত দাবিকারক রূপে প্রতিশ্রুত মসীহ যথা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন

অনেক মিথ্যা দাবী–কারকের নাম পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শোনা যায় এবং সেগুলো কালক্রমে নিশ্চুপ বা নিস্প্রভ হয়ে যায়। আশ্চর্য–জনক ঘটনা হলো এই যে নির্ধারিত সময়ে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক ব্যক্তি ঐশী নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ (খৃষ্টানদের ও মুসলমানদের জন্য) এবং ইমাম মাহদী (মুসলমানদের জন্য) এবং

অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসেবে চতুর্দশ হিজরি শতাব্দী মোতাবেক উনবিংশ শতাব্দী (খৃষ্টীয় সালের হিসেবে) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তথা ১৩০৬ হিজরিতে যে দাবি করেছেন তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং সত্যিকার দাবি। তিনি নিখিল-বিশ্ব-আহমদীয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক আন্দোলোন শান্তিপুর্ণ প্রচার–পদ্ধতি,যুক্তিপুর্ণ আন্তধর্মীয় বিতর্ক এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রচার–প্রচেষ্টা-মুলক কলমের জিহাদ করে চলেছে যা শান্তিবাদী সুধী-সমাজ এবং সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছে। অস্ত্রের দ্বারা অথবা যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের দ্বারা অথবা জঙ্গীবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী ধ্যান-ধারনা বা কর্মকান্ডের দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। কারণ অস্ত্র দ্বারা মাথা নত করা যেতে পারে,কিন্তু হৃদয় জয় করা সম্ভব নয়। মিথ্যা এবং নির্যাতিন–নিপীড়ণ দ্বারা সত্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে মিথ্যারই জয় হবে যা কখনই সামান্যতম বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ মানতে পারে না।

(২) যীশুর পুনরাগমন কালের বিশেষ ঘটনাবলী এবং সামাজিক অবস্থাবলীর সাক্ষ্য ঃ

(ক) খৃষ্ট–ধর্মের প্রচারক পাদ্রীদের পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতি এবং বাইবেলের প্রচারনার অভূতপূর্ব ব্যাপকতা ঃ

“আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে,আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।” (মথি ২৪ঃ১৪)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মিলিনিয়াম গবেষকদের ব্যাখ্যা হলো এই যে,উনবিংশ শতাব্দীতে এবং সেই সময় থেকে বাইবেলের মূদ্রণ,অনুবাদ ও প্রকাশনা পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। ১৮৪২ সনে Mr. Spicer তার পুস্তকে "Our Day in the light of Prophecy" লিখেছেন যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যীশুর বাণী ৯৫% পৃথিবীবাসীর কাছে পৌছানো হয়েছে। ১৮৪২ সনে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে খৃষ্টান মিশনারীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৮৪৪ সনে তুরস্কে খৃষ্টধর্মের প্রচার স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করে। উনিশ শতকের দিকে ইঙ্গিত করতঃ Dr. Leanard লিখেছেনঃ

"*A hundered Years Of Missions*", Dr. Leanard writes : "For the first time since the apostolic period occurred, an outburst of general missionary zeal and activity occurred. He was referring to the 19th Century."

Dr. A. T. Pearson wrote in *Modern Mission Century: "*India, Siam, Burma, China, Japan, Tukey, Africa, Mexico, South America were successively entered. Wifhin 5 years, from 1853 to 1858, new facilities were given to entrance occupation of seven different countries, together half the world population.”

* ‘World History' পুস্তকে B.V RAO মানব–ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশবাদী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি সম্পর্কে পার্থিব ব্যবসা–বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে উপনিবেশ বা কলোনী সমূহে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার-তৎপরতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেনঃ

"One of the ugliest effects of geographical discoveries was the birth of imperialism of the European powers. The European powers reached the shores of the countries of Afirca, Asia and America for the purpose of establishing trade links. Eventually they stayed there as conquerors and masters. These countries were turned into colonies and --- subjected to Other results which followed in the wake of geographical discoveries were the changes in the social order ---and the spread of the activities of Christian missionaries in the colonies. The voyages of the Explorers in the long run led to a commercial revolution in Europe. The geographical discoveries paved way for the Western domination of the world." (Page-209)

উনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম প্রচার তৎপরতার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যেতে পারে।

-Barrows Lectures 1896-97 'Christanity: The World-wide Religion', by John Henry Barrows: 'I might sketch Christian movement in Musalman Lands, which has touched, with the radiance of the Cross the Lebanon and the Persian mountains, as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day when Cairo and Damascus and Teheran shall be the servants of Jesus and when even the solitudes of Arabia shall be pierced and Christ, in the person of His desciples, shall enter the Kaba of Mecca and the whole truth shall at last be there spoken. This is eternal life that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ Whom Thou Hast sent'. (Page-42).

Mr. Faber writes in 'Eight Dissertations':

"The stupendous endeavors of one gigantic community to convey the Scriptures in every language to every part of the globe may well deserve to be considered as an eminent sign even of these eventful times.Unless I be much mistaken, such endeavors are preparatory to the final grand diffiusion of Christianity, which is the theme of so many inspired prophets and which cannot be so far distant in the present day".

পৃথিবীব্যাপী উপনেবিশবাদী কর্ম–কান্ডের দ্বারা ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট–ধর্মের এমন ব্যাপক প্রচার–বিস্তৃতি ইতিপূর্বে কখনই সংঘটিত হয় নাই যা ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে “দাজ্জালী ফিতনা” রূপেও নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে)। এই কারণে এই যুগে এরূপ দাজ্জালী তৎপরতাকে মোকাবেলা করার জন্য এবং পৃথিবীব্যাপী সত্য ধর্মীয় আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং পুর্ণ প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ এর–আগমনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

(চলবে)

খলীফাগণের তাহ্‌রীক শতভাগ আমল করার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত

মওলানা জাফর আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

দু'টি অংশ একটি হচ্ছে খেলাফত কি ও খলীফাগণের তাহরীকসমূহ কি? আর ২য় অংশ হচ্ছে শতভাগ লাব্বায়েক বলা। খেলাফতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। এভাবে খলীফার অর্থ দাঁড়ায় নবীর স্থলাভিষিক্ত বা নবীর প্রতিনিধি। আল্লামা বায়যাবি তার তফসীরে লিখেন- খলীফা হচ্ছেন তিনি যিনি কোন অন্য ব্যক্তির পর আসেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "খলীফার অর্থ হচ্ছে স্থলাভিষিক্ত। তিনি ধর্ম সঞ্জীবিত করেন। নবীগণের যুগের পরে যে অন্ধকার ছেয়ে যায় তা দূরীভূত করার জন্য যে ব্যক্তি আগমন করেন তাকে খলীফা বলে। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড)

আমাদের স্মরণ রাখা জরুরী যে নবুওয়াত ও খেলাফত দুটিই খোদার পক্ষ থেকে আসে। তবে উভয়ের মাঝে একটি নীতিগত পার্থক্য আছে তা হচ্ছে যখন পৃথিবীতে অন্ধকার অত্যাচার যুলুম পাপ ছেয়ে যায় তখন তা দূর করার জন্য খোদা নিজের পক্ষ থেকে নবী প্রেরণ করেন। নবী পৃথিবীতে আগমন করে যখন মু'মিনগণের জামা'ত নবীর স্থলাভিষিক্ত তাদের খলীফা মনোনীত করেন। যা আসলে আল্লাহ্ তা'লাই নির্বাচিত করেন। আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আহমদীগণকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে দেখান।

যাই হোক, এটি একটি পৃথক বিষয় একথা বলার মানে হচ্ছে যেভাবে নবীর হুকুম মান্য করা তাঁর নির্দেশিত পথে চলা আবশ্যক অনুরূপভাবে খলীফার আদেশ পালন করা এবং তার দিকনির্দেশনা মোতাবেক জীবন যাপন করাও আবশ্যক। কেননা ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক এটিও একটি পৃথক বিষয় যা পরে কোন এক সময় আলোচনা করা যাবে। আমরা যদি আজ থেকে ১৫১০ বছর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সা.) এর যুগের দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর বিনা দলিলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ঈমান আনয়ন করেন। শুধু তাই না বরং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যে কোন তাহরীকে তিনি (রা.) সবার আগে লাব্বায়েক বলেন এবং মানবীয় শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তা সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন বরং বলা উচিত পূর্ণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যার আনুগত্যতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইসলামের প্রথম খলীফা মনোনীত করেন।

এ পর্যায়ে আমি যুগ খলীফার ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে বা খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করার ব্যাপারে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাগণ তার জামাতকে কি নসিহত করে গেছেন বা কিভাবে আমাদের খলীফার কথাকে মান্য করা উচিত দুই একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেন, "হে বন্ধুগণ! তোমরা জেগে উঠো আর আনুগত্যের এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কমপক্ষে ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা কর যেন ১০০ জনের মাঝে ১০০ জনই এ ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম (সা.) বর্ণিত যে ব্যক্তি আমার ইতায়াত করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তা'লার ইতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের (প্রতিনিধি) ইতায়াত করে সে আমার ইতায়াত করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করে নিশ্চয়ই সে আমার অবাধ্যতা করে।" (বুখারী, মুসলিম) এ হাদীস মেনে চলে।

কাজেই খলীফার ডাকে সাড়া দেয়া মানে হচ্ছে নবীর ডাকে সাড়া দেয়া। যা পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেয়া। আর খলীফার অবাধ্যতা করা মানে হচ্ছে নবীর অবাধ্যতা যা পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করার নামান্তর।

প্রিয় মা ও বোনেরা এটি আমাদের অনেক বড় সৌভাগ্য আজ পৃথিবীতে কেবলমাত্র জামাতে আহমদীয়ার মাঝে আমাদের একজন খলীফা আছেন। আমাদের একজন অভিভাবক আছেন। আমাদের একজন পথপ্রদর্শক আছেন। যা আজ পৃথিবীতে আর কোথাও কোন জাতি, গোষ্ঠি কারো মাঝে দৃষ্টিগোচর হয় না। হ্যাঁ, কিছু নামধারী ইসলামের লেবাসধারী ইসলামের দুর্নামকারী মুসলমান আছেন যারা খলীফার দাবী করে। কিন্তু তাদের কথা-কাজে কর্মের সাথে এবং তাদের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী নাই। সেই ঢালের বাইরে যেন কারো শরীর না থাকে যাকে খোদা তা'লা তোমাদের হেফাযতকারী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। ইমামের পদাঙ্ক এমনভাবে অনুসরণ কর যেন মুহাম্মদ (সা.) এর আত্মা খুশি হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও বলেন, "তোমরা সবাই ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক চল। তাঁর নির্দেশের মাঝে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করো না। তিনি যেখানে সামনে যাওয়ার কথা বলে যাও আবার যেখানে থেমে যেতে বলে দাঁড়িয়ে যাও। (আনওয়ারুল উলুম)

আমাদের প্রাণপ্রিয় আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "জামাতের জীবন এটি খেলাফতেরই অনুগ্রহ। খেলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর। সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবনকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত কর, এতেই তোমাদের সকল উন্নতি নিহিত। তোমরা এমন হয়ে যাও যেন যুগ খলীফার সন্তুষ্টিই তোমাদের সন্তুষ্টি হয়ে যায়। খলীফার পদক্ষেপ যেন তোমাদের পদক্ষেপ হয়। (মাসিক খালেদ, ২০০৪, মার্চ)

আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) এর একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক বাটালা থেকে কাদিয়ান মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) এর নিকট এসে আবেদন করেন, আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ তাকে বাটালায় গিয়ে দেখে আসুন। তিনি (রা.) তাকে বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনুমতি নিন। তিনি ইমাম মাহ্দী (আ.) এর নিকট যান, তিনি (আ.) অনুমতি দেন। আসরের নামাযের পরে মৌলবী সাহেব যখন ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তো তিনি (আ.) বলেন, "আমার বিশ্বাস আপনি আজই ফেরত আসবেন" তিনি (রা.) বলেন, "জি আচ্ছা"। বাটালা পৌঁছে রোগী দেখার পর রাত হয়ে যায়। লোকেরা বলল, এখন রাত হয়ে গেছে রাস্তায় চোর ডাকাতের ভয়ও আছে তাছাড়া মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়েছে। আপনি সকালে যান।

মওলানা নুরুদ্দীন (রা.) বলেন, এক্কাগাড়ী ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক আমি পায়ে হেঁটে হলেও কাদিয়ান পৌঁছাব। কেননা আমার নেতা আমাকে আজই ফেরত যেতে বলেছেন। ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু রাস্তায় বৃষ্টির কারণে কাঁদা জমে এমন অবস্থা হয়েছে অনেক রাস্তা তাকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে এবং রাস্তায় কাঁটা ফুটে তার পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, রক্তে রঞ্জিত হয়। সকালে ফজরের সময় তিনি মসজিদে মোবারকে নামাযে উপস্থিত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নামাযের পরে জিজ্ঞাসা করেন, মৌলবী সাহেব রাতে এসে গেছেন। দ্বিতীয় কথা বলার পূর্বেই মৌলবী নূরুদ্দীন (রা.) বলেন, জি হুযূর। আর নিজের সফরের কষ্টের কথাও বর্ণনা করা পছন্দ করেন নি।

এর ফলে কি হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের অগ্রযাত্রায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রথম খলীফার আসনে সমাসীন করেছেন।

যুগ খলীফার তাহরীকসমূহ শতভাগ পালন করা আমাদের প্রতিটি আহমদী নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। খেলাফতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে আমি এখন আপনাদের সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। হুযূর (রাহে.) বলেন, "কেয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের সাথে নিজের আঁচল এমন শক্তভাবে বাঁধ যেন উরওয়াতুল উসকার মাঝে হাত দিয়েছ। যা কখনো ছুটে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার নয়। যদি তোমরা খেলাফতের সাথে থাক তাহলে খেলাফতও তোমাদের সাথে থাকবে। এটিই দুজনের হাত যা তৌহিদের ওপর এক হবে। (মাসিক খালেদ-১৯৯৪)

আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত এ খেলাফতের জন্য খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এবং অনেক বেশি দোয়া করি। সেই সাথে এই দোয়াও করা উচিত, খেলাফতের ছায়া যেন সর্বদা আমাদের ওপর বিদ্যমান থাকে।

যুগ খলীফার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী। আজ এম, টি, এ-এর মাধ্যমে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা যাদের সামর্থ্য আছে সরাসরি খলীফা যে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাত করতে পারে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

আমাদের খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যুগ খলীফার প্রতিটি নির্দেশ প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত এবং সেই সাথে আমলে রূপ দেয়া আবশ্যক।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনগণের জামাতের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,.....এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মু'মিন সর্বদা বলে শুনলাম আর আনুগত্য করলাম। তারা শ্রবণ করে এবং খুব ভালভাবে তা মনে রাখে এরপর নিজ মন প্রাণ দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার ওপর আমল করে। যে ব্যক্তি শ্রবণ করবে না সে আমল কিভাবে করবে? তাই আমাদের যুগ খলীফার তাহরীক সমূহ, খুতবাসমূহ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা অত্যন্ত জরুরী। যুগ খলীফার প্রতিটি তাহরীকে লাব্বায়েক বলা প্রতিটি আহমদীর জন্য জরুরী। কোন ধরনের তাহরীকের প্রতি মনোযোগ না দেয়া, তা ভুলে যাওয়া কোন আহমদীর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। হযরত খলীফা আওয়াল (রা.) বলেন, "বয়আত সেই বিষয় যার মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ ইতায়াত যেন করা হয়। খলীফার কোন একটি নির্দেশও যেন অমান্য করা না হয়।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "খলীফা হচ্ছেন শিক্ষক আর জামাতের সকল সদস্য ছাত্র। খলীফার মুখ থেকে যে শব্দই বের হয় তা থেকে আমল শূন্য থাকা উচিত নয়। (আল ফযল-১৯৪৬)

এখন আমি আপনাদের সামনে প্রাণপ্রিয় খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর কিছু তাহরীক উপস্থাপন করছি। হুযূর (আই.) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং খুতবাসমূহে জামাতকে উদ্দেশ্য করে নামায প্রতিষ্ঠা করা দোয়া ও ইবাদতের মান উন্নত করার প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া আরো তরবিয়তের অন্যান্য দিকেও বার বার দৃষ্টি

দেয়ার তাকিদ করেছেন। এ সকল বিষয় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি। প্রতিটি আহমদীর সত্যিকার ধ্যান ধারণা এবং চিন্তা চেতনা নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত আমরা কি দিয়ানতদারীর সাথে এর ওপর আমল করছি কি না। খেলাফত কোন রুস্‌ম রেওয়াজের নাম নয় বরং প্রকৃত আবেগ অনুভূতির বহির্প্রকাশ নিজেদের আমল দ্বারা প্রকাশ পাওয়া উচিত। তারপর তবলীগের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেছেন। আপনারা আল্লাহ্‌র ফযলের বারিধারা সদ্য সমাপ্ত ইউ,কে জলসায় দেখেছেন। এ বছর সমস্ত পৃথিবী থেকে ৫,৬৭,৩৩০ জন মানুষ বয়আত করে জামাতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এটি কেবলমাত্র যুগ খলীফার তাহরীকে লাব্বায়েক বলার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই ফল দান করেছেন। কাজেই আমরা যদি আরো বেশি নিজ গন্ডিতে জামাতের বাণী প্রচার করি তাহলে আরো বেশি সফলতা লাভ করব, ইনশাআল্লাহ্।

এছাড়া আমাদের প্রিয় ইমাম মসজিদ নির্মাণ, মানবতার সেবা ইসলাম প্রচারসহ আরো অনেকগুলো আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের একটি বড় অংশ যুগ খলীফার তাহরীকে লাব্বায়েক বলেন এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করেন। তাদের এই কুরবানীর ফলে জাগতিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা কি বরকত দান করেছেন সেই সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

এখানে একটি কথা না বললেই নয় আমাদের প্রিয় ইমাম (আই.) নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হওয়ার তাহরীক করেন। হুযূর (আই.) এর তাহরীকে যারা লাব্বায়েক বলেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অভুতপূর্ব সফলতা দান করেছেন। কাজেই যারা নিজেদেরকে আহমদী বলেন তাদের বলতে চাই যদি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ চান স্থায়ী জীবন চান তাহলে এখনই ওয়াদা করুন আমরা প্রত্যেকে যার যে সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ী নিজেদেরকে যুগ ইমামের নেযামে ওসীয়্যতের ডাকে সাড়া দিয়ে ওসীয়্যতে শামিল হব।

আইভরি কোষ্টের ঘটনা, সেখানকার আলিডু দরাগু সাহেব ২০০৯ সালে বয়আত করার পর থেকেই তিনি নিজের আয়ের ওপর নিয়মিত হিসেব করে চাঁদা দেয়ার ফলে অসাধারণ কল্যাণের কথা পুরনো সদস্যগণের সামনে আলোচনা করেন। তার কথা শুনে আরেক আহমদী যিনি ২০০৪ সালে বয়আত করেন তার বাজেট ছিল ২১০০ সিফাহ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের বাজেট ৫০০০ সিফাহ করেন। কিন্তু এখনো দেয়া আরম্ভ করেন নি। অথচ অসাধারণভাবে তার আয় বৃদ্ধি পায়। হুযূর বলেন, সে আমার কাছে আসে এবং বলে এখন থেকে আমি ১০,০০০/= সিফাহ হিসাবে চাঁদা আদায় করব।

গীনি কোনাকুরির এক যুবক পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার। বয়আতের সময় তিনি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করতেন খুব কম বেতন পেতেন। তাকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অবগত করলে সে বলে এসব চাঁদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা কোনটি? ওসীয়্যতের চাঁদা, চাঁদা আম, সালানা জলসার চাঁদা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত। সে বলে আমি আজ থেকেই ওসীয়্যতের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করব। ওসীয়্যতের কিছু নিয়ম নীতি আছে তা পুরা করলেই এ খাতে চাঁদা দেয়া যাবে। তিনি ওসীয়্যত পুস্তক পাঠ করেন এবং নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হন। সততার সাথে নিজ আয়ের ১০ ভাগের এক ভাগ চাঁদা দেন। আল্লাহ্ এত কল্যাণ দান করেছেন তিনি এখন একটি কোম্পানীর মালিক। সমগ্র দেশে তার সততার কারণে কোম্পানীর সুনাম আছে।

আইভরিকোষ্টের লাজনা প্রেসিডেন্ট সাহেবা বলেন– এ বছর কেন্দ্রীয় শূরায় মসজিদ নির্মাণের জন্য তাহরীক করলে প্রত্যেক সদস্যা ১ লক্ষ সিফাহ করে চাঁদা দেয়ার ওয়াদা করেন। বুর্কিনা ফাসুর আমীর সাহেব লিখেন, সুরি নামক গ্রামে বয়স্ক আহমদী কাবুরে সাহেব দীর্ঘদিন থেকে রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত তিনি ২০১০ সালে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ার ফলে, তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকেন। তিনি নিজে বলেন, চাঁদা দেয়ার কারণে আল্লাহ্‌র ফযলে এখন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সৌভাগ্যও হচ্ছে।

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের ঘটনা একজন আহমদী তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা ৫ লক্ষ রুপী লিখান এবং আদায় করে দেন। পরে যখন তিনি হায়দ্রাবাদ ফিরে আসেন তো তার ফোন আসে আমার ওয়াদা ১০ লক্ষ রূপী লিখুন। এরপর ঘরে ফিরে গেলে তার স্ত্রী বলেন আমার যে গহনাপাতি আছে তা আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতে চাই। আর তুমি এখনই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির নিকট পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি আর এক মুহূর্তও নিজের কাছে রাখতে চাই না।

বেনীন জামাতের আমীর সাহেব লিখেন এক যুবক অনেক দিন থেকে বেকার নাইজেরিয়ায় এক চাকুরীর সন্ধানে যায় কিন্তু ফেরত আসে। ওয়াকফে জাদীদের শেষ দুই মাস নভেম্বর ডিসেম্বর বাকী ছিল। তার চাঁদা বকেয়া পড়ে যায়। তার মনে হল পুরো পরিবার তো ঋণ করে চলছে তাহলে খোদার রাস্তায় চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা কেন। তাই তিনি ঋণ করে চাঁদা পরিশোধ করার তিন দিনের মাথায় তার একটি ভাল চাকুরী হয় আর দুই মাসের বেতনে সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়।

আমাদের প্রত্যেকের মনে করা আবশ্যক আমরা কেবল মৌখিকভাবে যুগ খলীফার সাথে নেযামে জামাতের সাথে ভালবাসার দাবী করছি। না কি নিজ কর্ম দ্বারা আমল দ্বারা তা প্রমাণ করছি। আজ জগতের অবক্ষয় থেকে মুক্তির বা সুরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুগ ইমামের প্রতিটি নির্দেশের ওপর পরিপূর্ণভাবে লাব্বায়েক বলা এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করা।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খেলাফতের সাথে নিজেদের এবং নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে সম্পৃক্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন।

এ নৃশংসতার শেষ কোথায়
মানুষের মূল্যবোধ কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

মাহমুদ আহমদ সুমন

বাহুবলের এই নৃশংস ঘটনার রেশ না কাটতেই গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় জয় এবং মনি নামে দুই শিশুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। এরপর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বনশ্রীতে নিজ মার হাতে খুন হয় নিষ্পাপ দুই শিশু নুসরাত আমান অরণী ও আলভী আমান। কিভাবে সম্ভব মা হয়ে নিজ সন্তানদের এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করতে।

হায় মানুষ! তুই কত নিষ্ঠুর, পাষণ্ড। আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে তোর দ্বারা এমন নিকৃষ্ট কাজ করা কিভাবে সম্ভব।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার গ্রামের মাঠে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলের চার শিশু। তাদের মধ্যে জাকারিয়া, তাজেল ও মনির সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই। তিনজনই সুন্দ্রাটিকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। অন্যজন ইসমাইল গ্রামের ইসলামিয়া কওমি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির ছাত্র। পাঁচ দিন পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে গ্রামের এক ছড়া (ছোট নদী) থেকে বালুচাপা অবস্থায় তাদের লাশ পাওয়া যায়। বাহুবল উপজেলার সুন্দ্রাটিকি গ্রামে এখন শুধু মাতম। বিস্ময়ে, শোকে স্তব্ধ পুরো গ্রামের মানুষ।

পত্র-পত্রিকায় আর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নিষ্পাপ শিশুদের মর দেহ বালুর নিচ থেকে উঠানোর দৃশ্য যা ছিল তা সহ্য করার মত ছিল না, এ নির্মম দৃশ্য অবশ্যই সবার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। হায় মানুষ! তুই কত নিষ্ঠুর, পাষণ্ড। আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে তোর দ্বারা এমন নিকৃষ্ট কাজ করা কিভাবে সম্ভব। বাহুবলের এই নৃশংস ঘটনার রেশ না কাটতেই গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় জয় এবং মনি নামে দুই শিশুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। এরপর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বনশ্রীতে নিজ মার হাতে খুন হয় নিষ্পাপ দুই শিশু নুসরাত আমান অরণী ও আলভী আমান। কিভাবে সম্ভব মা হয়ে নিজ সন্তানদের এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করতে। গলায় যখন ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করছে মা তখন সন্তান বলছিল মা আমি আমি ব্যাথা পাচ্ছি। হায় কি নিষ্ঠুরতা! মানুষের মূল্যবোধের যেন মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে আমরা কি ক্রমেই এক নিষ্ঠুর সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে মানবিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দয়া, মায়া, মমতাজাতীয় শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই? মানুষের অসহিষ্ণুতা যেন ক্রমেই লাগামছাড়া হয়ে উঠছে। কঠোর আইন থাকার পরও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছে না। গত বছর চাঞ্চল্যকর শিশু হত্যার একাধিক ঘটনার পর কয়েকটি মামলায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। তারপরও থেমে নেই অপরাধ। দিনের পর দিন শিশু হত্যা যেন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত শিশু নির্যাতন, শিশু হত্যার খবর পাই। এসব নির্মম খবরগুলো মানুষ নামে শ্রেষ্ঠ জীবকে কলঙ্কিত করে।

এবার আসা যাক ইসলামের শিক্ষার দিকে। ইসলামে শিশুদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসার বিষয়ে অত্যন্ত তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। শিশুদের প্রতি যেন কোনো ভাবেই কঠোরতা প্রদর্শন না করা হয় এবং দারিদ্রের ভয়ে তাদের যেন হত্যা না করা হয় সে বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'আর দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের এবং তোমাদেরও রিজিক দেই। তাদের হত্যা করা নিশ্চয় মহাপাপ' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩২)। এ আয়াতে শিশুদের হত্যার বিষয়ে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। শিশুদেরকে যদি সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত সুবিধার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ মানসিক ও নৈতিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করা হয় তাহলে তারা সমাজের সত্যিকার উপযোগী কার্যকর সদস্যে পরিণত হবে। অথচ আজ প্রতিনিয়ত শিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এমন কি মাতৃগর্ভেও আজ শিশু নিরপদ নয়। এমন এমন নজিরবিহীন,

নির্লজ্জ ঘটনা আজ ঘটে চলেছে যা শুনলে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আজকে যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন সব মর্মান্তদ ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তারা কিন্তু সেই মহান রাসূলেরই উম্মত হওয়ার দাবি করে। যিনি এসেছিলেন পশুতুল্য মানুষকে প্রকৃত মানুষ এবং ফেরেশতায় রূপান্তরিত করতে। আজকে সেই মহান রাসূলের অনুসারী হওয়ার দাবি করে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ তারা করে যাচ্ছে।

আমরা জানি, পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'লা এ বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ স্বরূপ মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে কিভাবে সম্মান করতে হয় তা শিখিয়েছেন এবং সমাজে শিশু ও নারীদের স্থান কোন পর্যায়ের তাও তিনি নিজ আমল দ্বারা দেখিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দেশে একের পর এক নির্মম ও নৃশংসতার সাথে শিশু হত্যা চলছে। বাহুবলের এ ঘটনার পূর্বে খুলনায় শিশু রাকিব হাওলাদারকে যেভাবে নৃশংস নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর আগে ৮ জুলাই চুরির অপবাদ দিয়ে সিলেটের শিশু সামিউলকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একের পর এক শিশু নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ২৬৭টি বেসরকারি সংস্থার জোট এবং ১০টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে করা ফোরামের পরিসংখ্যান বলছে, এ বছরের জানুয়ারিতে সারা দেশে ২৯ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। আর গত চার বছরে দেশে ১ হাজার ৮৫ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

পারিবারিক কলহ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, ব্যক্তিগত লোভ অথবা স্বার্থ আদায়ের অস্ত্র হিসেবে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে অপরাধপ্রবণতা বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। লোভ-লালসা, হিংসা-ক্রোধ ক্রমেই মানুষকে অমানুষ করে দিচ্ছে। এর জন্য দায়ী কে? এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে। মূল্যবোধ নিয়ে সামাজিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। এসব থেকে বাঁচতে হলে সমাজকেই প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাজে আজ শিশুর প্রতি নৃশংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার ফলে আজকাল সচেতন মহলে শিশুহত্যা প্রতিরোধের আহ্বান জোরদার হচ্ছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই শিশু হত্যাকে বারণ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবিদের প্রতি অনেক অসন্তুষ্ট হন। কারণ শিশুরা নিষ্পাপ, মাসুম, তাদের কোন গোনাহ নেই। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসূলের উম্মত হওয়ার দাবি করে এমন এমন ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে যা বিশ্ব মানবতাকেই ক্ষত-বিক্ষত করছে।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে নিষ্পাপ থাকে। মানুষ সাধারণত শিশুদের ভালোবাসে এবং আদর করতে চায়। আর শিশুদের ভালোবাসার প্রতি ইসলাম অত্যন্ত যত্নশীল। আসলে একটি শিশু বীজের মত। আমরা বীজকে যত ভালোভাবে পরিচর্যা করবো তার ফুল ও ফল তত ভালো হবে। আমরা জানি, নবী করীম (সা.) শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন, তাদের কাছে টেনে চুমু খেতেন। তাদের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করতেন। এমনকি নামাযের সময় দুষ্টামি করলেও তাদের সুযোগ করে দিতেন। একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) একবার হাসানকে (তার দৌহিত্র শিশু) চুমু খেলেন। তখন নবী করীম (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা.)। তিনি বিরক্ত সুরে বললেন, আমার ১০টি সন্তান রয়েছে। আমি কাউকে কোন দিন চুমু খাই নি। এ কথা শুনে নবী করিম (সা.) তার দিকে তাকিয়ে করুণার সুরে বললেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না। (বুখারী) অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আনসারদের দেখতে গিয়ে তাদের শিশুদের সালাম দিতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তাদের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করতেন। (নাসাঈ) অথচ আজ ইসলামের সমুহান শিক্ষার বিপরীতে অনেক লোককে দেখা যায় তারা শিশুর আচরণকে কিছুতেই মেনে নিতে চান না। কারণে-অকারণে তাদের গায়ে হাত তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অথচ শিশুদের গায়ে হাত উঠানোকে ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও মানুষ আজ দ্বিধা করছে না। সমাজে বিশৃঙ্খলা করার কোনো শিক্ষা ইসলামে পাওয়া যায় না। ইসলাম আমাদেরকে উশৃঙ্খল জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং নম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। যদি কেউ কষ্ট দিতে চায় ইসলামের শিক্ষা হল তার জন্যও তুমি শান্তির দোয়া কর। যেমন বলা হয়েছে, 'আর রহমান আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম' (সূরা আল ফোরকান, আয়াত: ৬৪)। সব ধর্মই চায় শান্তি, সব মানুষ চায় শান্তি অথচ আজ প্রতিটি মানুষ চরম অশান্তির মাঝে দিনাতিপাত করছে। যতদিন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে না ততদিন পৃথিবী অশান্তই থাকবে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত তখনই হতে পারে যখন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে।

মানুষের জন্য প্রেমপ্রীতি জন্ম না নিলে সে মানুষ হয় কিভাবে। সবার সাথে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন মানুষ হিসেবে তার প্রতি প্রীতিময় সম্পর্ক রাখার শিক্ষাই পবিত্র কুরআন থেকে পাওয়া যায়। তাই আসুন, সবার প্রতি ভালোবাসার ডানা প্রসারিত করি আর বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি মমতাশীল হই। শেষ করছি

কাজী নজরুল ইসলাম-এর মানুষ কবিতার দু'টি পংতি দিয়ে-

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সল কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

masumon83@yahoo.com

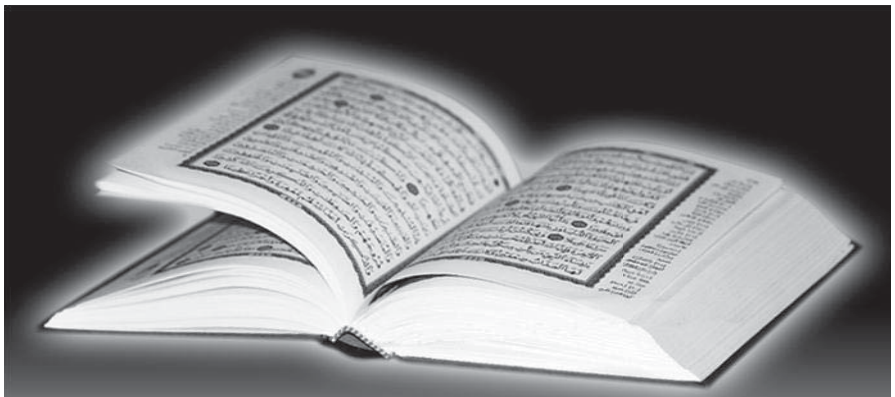

পবিত্র কুরআন ও দোয়া

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(৪র্থ কিস্তি)

পিতা-মাতার জন্য দোয়া

পিতামাতার জন্য একটি দোয়া পূর্বে বর্ণিত হয়েছে নিম্নে আরো কয়েকটি দোয়া পাঠকদের সুবিধার জন্য তুলে ধরছি। সূরা ইবরাহীমে বর্ণিত দু'টি দোয়া, আয়াত নম্বর ৪১ ও ৪২।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤١﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾ ع ١٨

অর্থ: হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি আমার দোয়া কবুল কর।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যেদিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকেও ক্ষমা করে দিও।

ওপরে বর্ণিত দোয়া দু'টি খুবই কার্যকারী দোয়া। এ দোয়াগুলো খুব বেশি বেশি পাঠ করা জরুরী। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বাবস্থায় শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকেন। এই বাস্তব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও মহত্ব এবং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করেন। এটাই মানবীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে উপলব্ধি যা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন নিজ করুণা ও অনুকম্পায় তাদের দুর্বলতা ঢেকে দেন যাতে তাঁদের নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ

অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে, সব মু'মিন পুরুষকে এবং সব মু'মিন নারীকেও ক্ষমা কর। (সূরা নূহ্ ঃ ২৯)

এই দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবীগণ দয়া ও করুনায় ভরপুর হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই করুণা সিন্ধু। নূহ্ (আ.) এর এই প্রার্থনা থেকে বুঝা যায়, তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল। ক্রমাগত বহুদিন ধরে তিনি অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যুগব্যাপী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো। তাঁর অল্পসংখ্যক অনুসারীদের সাথে আর দু' একজনেরও যোগদানের সম্ভাবনা যখন থাকলো না এবং এরা ও চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলো, তদুপরি অবিশ্বাসীদের দুস্কৃতির পরিধি যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন অবশ্য এতই ভায়াবহ রূপ ধারণ করলো যে নুহ্ (আ.) এর মত দয়ার্দ্র হৃদয় ব্যক্তিও তাদের জন্য বদ্ দোয়া করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এইরূপ একই অবস্থায় নবী করীম (সা.) তাঁর শত্রুদের প্রতি যে অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসামান্য ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন তা জাগতিক জীবনে কল্পনাতীত ছিল। উহুদের যুদ্ধে যখন তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং জখমে-জখমে শরীর ভরে গেল, সারা দেহে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তখন সেই চরম অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো স্বত:স্ফুর্তভাবে বের হয়ে এসেছিল, তা ছিল, "যে জাতি তাদের প্রতি সমাগত নবীকে জখম করেছে এবং তাঁর মুখমন্ডলকে রক্তাপ্লুত করেছে শুধু এই কারণে যে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন, সেই জাতি কি করে পরিত্রাণ লাভ করে! হে আমার প্রভু! আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর, তারা কি করছে তারা তা বুঝে না।" (যুরকানী ও এবং হিশাম) এই ছিল আমাদের মহানবী (সা.) এর আকুলতা। শত বিরোধিতা সত্বেও উম্মতের কষ্ট তিনি (সা.) সহ্য করতে পারতেন না। তাই উম্মতের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন।

পুণ্যবান ও সৎ সাধু সন্তানের জন্য দোয়া

قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

অর্থ: "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান সন্ততি দান কর। নিশ্চয় তুমি অধিক দোয়া গ্রহণকারী" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৯)। এই দোয়াটি মূলত হযরত যাকারিয়া (আ.) দীর্ঘকাল যাবৎ বার বার করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দের বিভিন্নতা সহ এ দোয়াটি উল্লেখ দেখতে

পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং ইয়াহ্ইয়ার জন্মের সুসংবাদ ও দিয়েছিলেন যা পরের আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত যাকারিয়া বনী ইসরাঈলের একজন পবিত্র লোকের নাম। তবে পবিত্র কুরআনে তাঁকে নবী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যাকারিয়া (আ.)-এর আর একটি দোয়া হলো,

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে একা ছেড়ো না। আর তুমিই উত্তরাধিকারীদের মাঝে সর্বোত্তম" (সূরা আল্ আম্বিয়া ঃ ৯০)।

এরপর যে দোয়াটির বর্ণনা দিব তা হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন নিজের উত্তরাধিকারীর জন্য। দোয়াটি এরূপ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল (উত্তরাধিকারী) দান কর" (সূরা সাফফাত ঃ ১০১)। এই দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে এক পরম সহিষ্ণু পুত্র দান করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। যার বিস্তারিত বিবরণ সমগ্র কুরআন ব্যাপী রয়েছে।

পরিবার ও সন্তানের দিক থেকে চোখের স্নিগ্ধতা লাভের দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের জীবন সঙ্গী ও সন্তান সন্ততী হতে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর (উপকরণ) দান কর এবং আমাদের (প্রত্যেককে) মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও" (সূরা আল ফুরকান, ৭৫)। ওপরে উল্লেখিত দোয়াগুলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুবই জরুরী। কেননা উত্তম উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া সকলের জন্য খুবই জরুরী। কেননা উত্তম উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়া সকলের জন্য কল্যাণময়। যত বেশি সম্ভব দোয়াগুলো পাঠ করা হতে বিরত না হওয়া।

সন্তানদের সংশোধন ও সালেহ্ হওয়ার জন্য দোয়া

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ: "হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার ও মাতাপিতার প্রতি অনুগ্রহ করেছ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য আমাকে দাও এবং আমাকে এরূপ সৎকাজ (করারও সামর্থ্য দাও) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর তুমি আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমার দিকেই বিনত হই। আর নিঃসন্দেহে আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন" (সূরা আল্ আহকাফ, ১৬)।

একটি সন্তান জন্মের ব্যাপারে মাতাপিতার অনেক অবদান থাকে। যার স্থান শোধ করার মত নয়। তাই সন্তানের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'লাই সন্তান জন্মের যাবতীয় উপকরণ মাতাপিতার মধ্যে সৃষ্টি করেন। সেই সাথে নিজ সন্তানের জন্যও দোয়ার কথা বলা হয়েছে। যাতে সন্তান নেক ও সালেহ্ হয়। অতি চমৎকার একটি দোয়া যা সকলেরই মুখস্ত করা উচিত।

ঐশী কৃপা, স্বচ্ছলতা ও সহজলভ্যতার দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমারই কাছ থেকে আমাদেরকে (বিশেষ) কৃপা দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও (সূরা আল কাহাফ ঃ ১১)।

ঐশী কৃপা পাওয়ার ক্ষেত্রে এই দোয়াটি খুবই উপকারী। মানুষ অনেক সময় দোয়া করতে চায় না, আবার দেখা যায় যে, কিছুদিন দোয়া করে, প্রার্থনা করে এবং ইবাদতে মজে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে তা আবার ছেড়ে দেয়। এটা ঠিক নয়, সর্বদা দোয়াতে লেগে থাকা উচিত। দোয়া বা প্রার্থনা চালিয়ে গেলে কোন না কোন সময় তার ফল লাভ হবেই। দোয়ার ফলে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে এবং সকল কাজই সহজ সাধ্য হয়ে যায়। এগুলো পরীক্ষিত বিষয়, সুতরাং ধৈর্য না হারিয়ে একাগ্রতার সাথে দোয়াতে মগ্ন হওয়া বান্দার জন্য আবশ্যক। পৃথিবীতে যা কিছুই ঘটবে বা পরিবর্তন হবে তা দোয়ার দ্বারাই সম্ভব। দোয়ার মাঝে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়া চাই। কোন জিনিস লাভ করতে হলে যেমন পরিত্রাণ প্রয়োজন তেমনি দোয়ার ফল লাভের জন্যও সাধনা থাকা প্রয়োজন তবেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। পৃথিবীতে সূর্য বা চাঁদের আলো, মেঘ সৃষ্টি হওয়া যা কিছুই আমরা পাইনা কেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ঐশী কৃপাতেই পাই। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বত আছে বলেই প্রতিনিয়ত আমরা তাঁর সেবা উপেক্ষা করে থাকি। তাই আমাদেরও দায়িত্ব হবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা বা দোয়া করা। দোয়া করতে গিয়ে আমরা যেন কখনো অলসতা প্রদর্শন না করি। ছোট বেলা থেকেই এই অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া উচিত। বড়রা যদি এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় তাহলে ছোটরা দেখে শিক্ষা লাভ করবে। তাই ইবাদত কালে বিনয় ভাব ও একাগ্রতা খুবই জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করুন।

ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের জন্য দোয়া

"হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তুমি আমাদের শাস্তি দিও না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৭) মানুষের স্বভাবের মাঝে এটি রাখা হয়েছে যে মানুষ ভুল করবে বা ভুলে যাবে। তার জন্য প্রতিকার রাখা হয়েছে। সেই ব্যক্তিকেই কেবল শাস্তি দেয়া হবে, যে স্বজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় মন্দ কাজে লিপ্ত হবে। যদি ক্ষমা বা মাগফিরাতের কোন রাস্তা না থাকতো তাহলে দোয়ার কথা বলা হতো না। ভুল করলে বা ভুলে গেলে আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য ক্ষমার আচরণ করে থাকেন। তবে ক্ষমার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। ভুল করবো অথচ ক্ষমা চাবো না এমনটি হলে চলবে না। মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন ভাল হওয়ার জন্য ডাক্তার-কবিরাজের নিকট যায়। কেননা তাদের চিকিৎসায় রোগ ভাল হবে। অনুরূপভাবে মানুষের দূর্বলতার জন্য যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া চাইতে হবে। তবেই তিনি ক্ষমা করবেন।

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১০ম কিস্তি)

১৯৬৩

২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৪তম সালানা জলসা। এ জলসা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ)-এর নির্দেশে তৎকালীন সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া সাহেবজাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) (যিনি পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হিসেবে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন), ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদলসহ ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আগমন করেন। এ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ১. মোহতরম শেখ বশির আহমদ, (লাহোর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), ২. মোহতরম মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, (সম্পাদক আল ফুরকান এবং মিশর ও প্যালেস্টাইনের সাবেক মোবাল্লেগ), ৩. মোহতরম মওলানা শেখ মোবারক আহমদ, (ইংল্যান্ড ও আফ্রিকার মোবাল্লেগ), ৪. মোহতরম চৌধুরী জহুর আহমদ এবং ৫. মোহতরম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী। তাঁদের আগমনে সালানা জলসা সরগরম ও আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে।

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ জলসার প্রথম অধিবেশনে হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং জলসার শুরুতে এর কামিয়াবীর জন্য ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। অতঃপর জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার সামসুর রহমান উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান। বক্তৃতা পর্বে আবেগাপ্লুত ও প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ। তিনি জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সকলকে আহ্বান জানান। অতঃপর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী এবং শেখ মোবারক আহমদ সাহেব। অতঃপর সম্মানিত সভাপতি সাহেবযাদা মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের আলোকে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় এক অমূল্য ভাষণ দান করেন, যা শ্রোতৃমন্ডলীকে অভিভুত করে তোলে।

২৮ সেপ্টেম্বর জলসার দ্বিতীয় দিনের সকালে ৮ হতে ১১টা প্রথম অধিবেশনে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পর্দার আড়াল থেকে মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী ও সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। বিকালের অধিবেশন বেলা ৩টায় ডাক্তার আব্দুল হামিদ চীফ মেডিকেল অফিসার পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তখন ইয়াজুজ ও মাজুজ বিষয়ে মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের পূর্বে বিকেলে (বিরতির সময়) সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব ও আগত মেহমানদের সম্মানার্থে ঢাকাস্থ শাহবাগ হোটেলে এক চা চক্রের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে দেশবরণ্য অনেক সুধীজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি আমীর উদ্দীন, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এ, কে, এম, বাকের, পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এস, এম, হাসান, পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সিনিয়র ডেপুটি স্পিকার গমিরুদ্দিন প্রধান, ঢাকা বিভাগের কমিশনার গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট আলহাজ্জ মৌলভী ফজলুল করিম এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকসহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

এ মহতী প্রোগ্রামে জাষ্টিস শেখ বশির আহমদ, শেখ মোবারক আহমদ এবং অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিত্ব সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব বিশ্বব্যাপী ইসলামের খেদমতে জামাতে আহমদীয়ার অবদানের ওপর এক অনন্য সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর সমবেত সুধীজনের সাথে এক হৃদয়গ্রাহী প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে জামাতে আহমদীয়াকে যারা ভারতবর্ষের মাঝে একটি ক্ষুদ্র দল বলে মনে করতেন তারা বিশ্বব্যাপী জামাতে আহমদীয়ার ব্যাপকতা শুনে বিস্মিত হন। অতঃপর ব্যারিষ্টার সামসুর রহমান সাহেব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের দোয়া পরিচালনার পর চা চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর জলসার শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে জাস্টিস বশির আহমদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। ভাষণ দান করেন মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী, এস, এম, হাসান, মওলানা শেখ মোবারক আহমদ এবং মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেব। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় ছিল যথাক্রমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে আহমদীয়া আন্দোলনের অগ্রগতি, ইসলাম ও সামাজিক জীবন, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যবহার এবং ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব। অতঃপর সভাপতির জ্ঞানগর্ভ ভাষণের পর অধিবেশ সমাপ্ত হয়।

সমাপনী অধিবেশনে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এতে ভাষণ দান করেন গোলাম সামদানী খাদেম, জাষ্টিস শেখ বশির আহমদ, মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব এবং শেখ মোবারক আহমদ সাহেব। তাঁদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে খিলাফত ইসলামের একটি আবশ্যিক স্তম্ভ, ইসলাম ও বস্তুবাদ, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনী ও শিক্ষা। সর্বশেষে জলসায় প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দান করেন, যা শ্রোতৃমন্ডলীর হৃদয়কে পুলকিত করে তোলে। অতঃপর সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের হৃদয় নিংড়ানো দোয়ার মাধ্যমে ৪৪তম সালানা জলসার সমাপ্ত হয়। এতে বার শত আহমদী এবং অনেক জেরে তবলীগ বন্ধু যোগদান করেন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা

প্রত্যহ কুরআন পাঠের গুরুত্ব

মেনহাজ করিম (আশা), রাজশাহী

সূচনা ঃ

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এটি মানবজাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী এবং হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ। পবিত্র কুরআন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত এবং এর মর্যাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাঁর শেষ শরিয়ত 'কুরআন' হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযেল করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "নিশ্চই এ কিতাব (কুরআন) তোমার ও তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু।"

এটি মু'মিনের জন্য শেফা (আরোগ্য) দানকারী এবং মু'মিনগণের জন্য হেদায়াত স্বরূপ ও পথপ্রদর্শক। কুরআন মানবজাতিকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে আনে। এটিকে বেশি বেশি করে তেলাওয়াত করা ও আমল করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী।

কুরআন পাঠের উত্তম সময় ঃ

সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

অর্থ ঃ তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর। প্রভাতে কুরআন পাঠ নিশ্চই (আল্লাহ্‌র নিকট) গ্রহণীয়।

এখানে, আল্লাহ্ তা'লা প্রভাতে অর্থাৎ ফজরের নামাযের পর কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা মুয্যাম্মিলের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা যত্ন সহকারে আদবের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রত্যহ কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন– একদা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেছিলেন,

"অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে তখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তা পরিস্কার করার উপায় কি? হুযূর (সা.) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত"। (মিশকাত)।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "যে কুরআন পড়েছে এবং একে মুখস্থ রেখেছে, অতঃপর তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে তাকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে দাখিল করাবেন।" (তিরমিযী)

হযরত মুয়ায জুহানী (রা.) বলেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "যে ব্যক্তি প্রত্যহ কুরআন পাঠ করে এবং এতে যা আছে এর উপর আমল করেছে, তার মা বাবাকে কিয়ামতের দিন এমন এক তাজ পরানো হবে যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে।" (আহমদ আবু দাউদ)

হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সা.) বলেন– "যে মু'মিন প্রতিদিন কুরআন পাঠ করেন, তার দৃষ্টান্ত হলো কস্তুরীর, যার– সুগন্ধ আছে স্বাদও আছে। যে মু'মিন প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মত যার স্বাদ তো আছে কিন্তু ঘ্রাণ নেই। যে মুনাফেক প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত রায়হান ফুলের মত–যার সুগন্ধ আছে কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে না, তাঁর দৃষ্টান্ত বাবুল কাঁটার মত তার কোন স্বাদ নেই, উপকারিতাও নেই।" (মুসলিম শরীফ)

নিজ আত্মার কল্যাণ হেতু কুরআন প্রত্যহ পাঠ করা ও এতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভই কামনীয়।

কুরআন সর্বোত্তম কিতাব ঃ

কুরআনই একমাত্র বিশেষ হেদায়াতপ্রাপ্ত কিতাব। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কুরআন প্রসঙ্গে বলেন– "এতে তোমাদের আগের কালের মহাসংবাদও রয়েছে এবং তোমাদের পরের যুগেরও সংবাদ"।

এই গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌র। প্রত্যহ কুরআন পাঠের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "প্রত্যহ গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করবে। কুরআনকে এক অনাবশ্যক দ্রব্যের মতো ফেলে রেখো না, কুরআনেই আমাদের জীবন রয়েছে। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে

বলেছেন– "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে।" এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা কুরআন শরীফের ওপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফেই আছে। এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যা কুরআন শরীফে নাই। 'কেয়ামতের' দিনে ঈমানে সত্যাসত্যের মানদন্ড একমাত্র কুরআন শরীফ-ই হবে। কুরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যা আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা যদি খ্রিষ্টানদেরকে দেওয়া হতো তবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না, এই নেয়ামত ও হেদায়াত যদি ইহুদীদেরকে তওরাতের স্থলে দেওয়া হতো তবে তাদের কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– "যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে তবে কুরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করতে পারে। তোমরা যদি স্বয়ং কুরআন শরীফ হতে বিমুখ না হও তবে তোমাদের নবী সদৃশ করতে পারে।

কুরআন আমাদেরকে ঐ সকল আশিস প্রদান করতে চায়, যা পূর্ববর্তীদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।

প্রত্যহ কুরআন পাঠের ফযিলত ঃ

মহান আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করেছেন। যার আয়াতসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠনীয়। যা পাঠের কারণে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়. তাদের যারা তার প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে, এর দ্বারা তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করেন এবং যাকে চান বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন, এমন ব্যক্তির জন্য কেউই হেদায়াত দাতা নাই।

এই কিতাব বার বার পাঠ করার মাধ্যমে মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের নীতিমালা ও শিক্ষাসমূহ আয়ত্ত করতে পারে। পূর্ণতম কিতাবরূপে কুরআনে সর্বশেষ বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রত্যহ কুরআন পাঠ করে তাদের জীবন সাবলীল, সুন্দর, সমৃদ্ধশালী ও পবিত্র হয়।

সূরা আল ফাতের আয়াত নং ৩০-এ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থ ঃ নিশ্চই যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তারা এক বাণিজ্যের আশা রাখে যা কখনো বিফল হবে না।

হুযূর (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পাঠ করে তার এই একটি পুন্যের বিনিময়ে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তিনি (সা.) আরো বলেছেন– জিহ্বার তোতলামি থাকার কারণে কোন ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে না পারে তথাপি সে আগ্রহভরে চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। যে ব্যক্তি প্রভাতে অয়তুল কুরসী পাঠ করে তবে এই আয়াতের কল্যাণে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে খোদার হেফাযতে থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "কুরআন পাঠ কর কেননা বিচার দিবসে তা পাঠকের শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

প্রকৃত মুক্তি ও মর্যাদা প্রাপ্তি মূল কুরআন ঃ

মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দিক নির্দেশনার জন্য কুরআন আবশ্যকীয়। বর্তমান জগতে অবক্ষয়ের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রত্যহ কুরআন পাঠ করা এবং এর শিক্ষার ওপর আমল করা জরুরী। নিয়মিত এবং যথযথভাবে কুরআন পাঠ করাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত মু'মিনের একটি চিহ্ন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন– "যাদেরকে আমরা আল কুরআন দান করেছি এবং যারা যথযথভাবে আবৃত্তি ও অনুসরণ করবে তারাই এর ওপর প্রকৃত ঈমান রাখে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পাঠ করে ৭০ হাজার ফিরিশতা তার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করতে থাকে এবং সূরা মূলক পাঠ মানুষকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন– "কুরআন পাঠকারী হাফেযের দৃষ্টান্ত হলো, সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফিরিশ্‌তাদের সাথে থাকবে। আর সে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হিফ্‌য করা তার জন্য কষ্ট হলেও তা হিফ্‌য করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।" (বুখারী কিতাবুত তফসীর)

হযরত আবু বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে পাঠ করতে থাকো এবং ওপরে উঠতো থাকো (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকো)।" (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "খোদা তা'লা তোমাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন। কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী কেউই হবে না, খোদা তা'লা তোমাদেরকে ওহী, ইলহাম, খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপ হতে কখনও বঞ্চিত রাখবে না। তিনি পূববর্তী উম্মতকে যে সকল অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন তদসম্পদ তিনি তোমাদেরকে প্রদান করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতঃ খোদা তা'লার প্রতি বাক্যালাপের কথা মিথ্যা বলবে আমি তদ্রুপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদা তা'লা এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তার সাথে প্রতারণা করেছে।"

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত পথ কুরআনের মধ্যেই নিহিত। এটিই প্রকৃত মুক্তির পথ। (কিশতিয়ে নূহ্)

উপসংহার ঃ

একজন মুসলমান ও পবিত্র কুরআন পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুরআন ছাড়া কল্যাণ সম্ভব নয়। আমাদের প্রত্যেককে কুরআন পাঠের জন্য সময় বের করে নিতে হবে। যদি কুরআনের জন্য আমাদের ভালোবাসা থাকে এবং স্বাদ আমরা পেয়ে যাই তবে সময় বের করা কোন কঠিন কাজ হবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব কাজই আমরা করি, আর এমন কাজ করে নিলে আমরা পুরোপুরিই লাভবান হবো। আজ আবার ইসলামের সূর্যকে মধ্যগগনে আলো বিচ্ছুরিত দেখতে হলে কুরআন প্রত্যহ পাঠ করতে হবে এবং কুরআনকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে কুরআনের মর্মবাণী বুঝার এবং এর ওপর আমল করার তৌফিক দিন। (আমীন)।

পাপ

মানুষের আত্মাকে রুগ্ন করে দেয়

আবু সালেহ্ আহমদ
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

দু'টি বর্ণের একটি শব্দ 'পাপ'। এটি ছোট একটি শব্দ হলেও এর প্রভাব এবং এর বিস্তার এ জগতে স্পষ্ট বিরাজমান। কেউ জেনে-বুঝে, আবার কেউ না জেনে তা প্রতিনিয়ত করেই চলেছে। আসলে আমরা বুঝতেই পারি না যে, আমরা কি ভাবে পাপ করছি। কিন্তু কুরআনের মতে সকল মন্দ কর্মই পাপ। তারা সেই কর্ম অনুযায়ী শাস্তি পাবে। হাদীসের বর্ণনা মতে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ ঈমানদার হল সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ধূর্ত ও হীন চরিত্রের হয়ে থাকে (তিরমিযী) অর্থাৎ পাপ এমন একটি কাজ যা পাপী ব্যক্তিকে পুণ্য থেকে দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টায় রত থাকে। তার সেই চেষ্টা মানুষের চরিত্রের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারলেই সে পাপ করে আর যদি না পারে তাহলে তার হৃদয় পবিত্র সাব্যস্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন প্রকৃতপক্ষে পাপ এমন জিনিষ যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য, তাঁর জন্য উল্লসিত প্রেম নিয়ে তার জন্য প্রেমপূর্ণ স্মরণ হতে স্খলিত ও বিচ্যুত হয়। মাটি হতে কোন উৎপাদিত বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে দিন দিন শুকাতে থাকে এবং অবশেষে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এমন অবস্থা সেই ব্যক্তিরও হয়ে থাকে যার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রেম হতে মূলোৎপাটিত হয়ে গিয়েছে। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড)।

পাপের একমাত্র কারণ আল্লাহ্ তা'লাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ আমাদের অন্তরে আমাদের মন-মস্তিস্ক থেকে আল্লাহ্‌কে বিরাজমান না রাখার কারণে তাঁর ভয় আমাদের মনে আসে না। তাঁর ভয় নেই বলে আমরা তাঁর শাস্তিকেও ভয় পাই না। এই কারণে পাপ আমাদের মাধ্যমে আমাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা পাপ করে তারা নিজেদের মাঝে কোন না কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লাকে মৃত জ্ঞান করে রেখেছে। কেননা কেউ যদি ঐ মন্দ কাজটি করে কিন্তু সেই মন্দ কর্মের ফলে আল্লাহ্ যে তাকে শাস্তি দিতে পারেন তা জ্ঞান না রাখে এবং মন্দ কাজ করেই চলে, তা হলে তো আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির ভয় সেই ব্যক্তির মনে নেই বরং সে শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে মৃত বানিয়ে নিয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভাষায় "পাপ হল সেই কাজ, যাতে মানুষের আত্মা রুগ্ন হয়ে যায়। এবং ঐশী-দর্শন লাভের যোগ্য থাকে না। আর এজন্য সেই যাত্রা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব কর্মের কোন কোনটি আছে দৈহিক আর কোন কোনটি আছে আধ্যাত্মিক। দৈহিক কর্মগুলো অধিকাংশই এরকম, যেগুলোর ক্ষতি দেখা যায় যেমন, মিথ্যা, হত্যা ইত্যাদি পাপের ক্ষতি সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। তিনি (রা.) এর বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ যে বিষয়গুলোর কারণে পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে সেগুলো হলো ঃ মূর্খতা বা জ্ঞানহীনতা, লোভ যা মূর্খতা থেকে আসে, রাগ বা ক্রোধ, অতিরিক্ত ভয়, অতিরিক্ত ভালবাসা,, অতি উচ্চাকাঙ্খা, অত্যধিক নৈরাশ্য, জিদ, সীমাতিরিক্ত কামভাব, অথবা কামভাবের স্বাভাবিক কমতি, উত্তরাধিকারী, সংসর্গের প্রভাব যা মানুষ তার চতুর্দিকে যা দেখে তা নকল করে কিন্তু এর ফলাফল একবারও চিন্তা করে দেখে না। তা মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, খেলার সাথী, বন্ধুও হতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, মানুষ এমন সব কথাকে জ্ঞানের কথা মনে করে কিন্তু তা জ্ঞানের কথার অন্তর্ভুক্ত নয়। অভ্যাস যা পাপের অপর একটি উৎস, আলস্য ও গাফিলতি, যাচাই বাছাই করার ক্ষমতাহীনতা, যুগের ধ্যান-ধারণার গুপ্ত প্রবাহ। (মিনহাজুত্তালেবীন)

মহান আল্লাহ্ তা'লা যেমন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে মানুষের মাঝে তিনি দুর্বলতা দিয়েছেন এবং মানুষকে তিনি তাদের নিজের মর্জিমত চলার ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতা থেকেই মানুষ পাপ করে থাকে। যে এই ক্ষমতাকে ভাল উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় সে-ই পূণ্য করে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দেখানো শৃঙ্খলার মধ্যে চলে তারাই সফলকাম হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর তার (শয়তানের) আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য একমাত্র তাদের ওপরই থাকে যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং যারা তার (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে (১৬ঃ১০০-১০১) তারা (শয়তান) মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর ওপর নাযেল হয় (২৬ঃ২২৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, মহাপাপ সমূহ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, নর হত্যা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (বুখারী) শির্ক! যা প্রথম পর্যায়ের বড় পাপ। আল্লাহ্ তা'লা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু এই গুনাহ ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ তাঁর সাথে যারা অংশীদার দাঁড় করায়। শিরক যে শুধু মূর্তিপূজা তা কিন্তু নয়। এমন অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যা যা শির্ক এর আওতাভুক্ত কিন্তু তা আমরা বুঝতে পারি না বা জানি না। যেমন- এমন কোন কাজ-কর্ম, এমন কোন কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার যা পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র বিপরীতে যায় তা সামান্য হলেও শির্ক এর সাথে শামিল হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সন্তানদের মারধর করাকেও শির্ক এর সাথে শামিল করেছেন। হাদীস শরীফে "যারা নামায পড়ে না তারা কুফর করে বলে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন। মানুষের এই কর্মের কারণে তারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা থেকেও দূরে অবস্থান করছে। আর তা থেকেই এই পাপের বিষ মানুষের সমস্ত শরীরে প্রভাব বিস্তার করছে। শুধু পাপকে চিনলেই হবে না এ থেকে বাচার ও পাপ থেকে রক্ষা পেতে ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনাও করতে হবে তা না হলে এ পাপ থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হবে।

পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন মাধ্যম তৈরী করে রেখেছে। যেমন– খ্রিষ্টানরা যীশুর মৃত্যুর সাথে সকল পাপের অবসান করে দিয়েছে আর হিন্দুরাতো পুনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাস

নিয়ে রয়ে গেছে, ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র ইসলাম ধর্মই এর থেকে মুক্তি পাবার গ্রহণীয় এবং বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন "এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমরা যা কিছু কর তা তিনি অবগত আছেন (৪২ঃ২৬) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই একমাত্র ক্ষমাকারী এবং তওবা কবুলকারী। অন্য কেউ নয়।

হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তওবাকারীর ওপর এত খুশি হয় (যখন সে তওবা করে) যেমন মরুভূমিতে একটি উট হারিয়ে যাবার পর তা ফেরত পেয়ে গেল। (বুখারী) আবার অন্য রেওয়াতে আছে যে, "পাপ হতে সত্যিকার অর্থে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন পাপ নেই (ইবনে মাজাহ) আল্লাহ্ তা'লা চান, যেন তাঁর বান্দারা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চায়। এতে করে তিনি খুশি হন এবং তাঁর ঐ বান্দাকে মাফ করে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "নতুবা কুরআনে তো এটি ভুরি ভুরি সংখ্যায় পাওয়া যায় যে, লজ্জিত হয়ে তওবা করলে এবং অভ্যাস ত্যাগ করলে ও ক্ষমা চাইলে পাপ ক্ষমা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা অনুতাপকারীগণকে ভালোবাসেন এবং যারা এই কথার ওপর জোর দেয় যে, যে কোন উপায়ে হোক মানুষ পাপ হতে পবিত্র হয়ে যাক (চশমায়ে মারেফাত)

উত্তম ও রূহানীয়তের মাধ্যমেই সম্ভব পাপকে হার মানানো। তাহলেই আমরা আধ্যাত্মিকতার মানদন্ডে উন্নীত হব। এই উত্তম চরিত্র বা রূহানীয়াত কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তার পাওয়া সকল পাপ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পথে তাদের শৃঙ্খলের মধ্যে অবস্থানের মাধ্যমে। মানব জীবনকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত থাকা।

কুরআনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী যত জাতিই আছে তারা শুধু এই জন্যই বিপথগামী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা হল এই পাপ! ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ ধর্ম। যেখানে প্রতি শতাব্দিতে মানুষকে পাপ থেকে বাচানোর জন্য একজন করে সংস্কারক আসবে। একটি বিষয় খেয়াল করলে দেখা যাবে যে পাপ পূণ্য নিয়েই সবকিছু। এর মধ্যেই আমাদের পরবর্তী ভাগ্য নির্ধারণ হবে। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই পাপকেই দমন করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর পুণ্যবান মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এমন অনেক ঘটনাই পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যা করার পরে শত হত্যাও পূরণ করে। তার এই পাপকর্মের পরেও সে যখন ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে খাঁটি তওবা করে তখন গাফুরুর রাহিম মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। এই হল আমাদের পরম দয়াময়, পরম করুণাময় খোদা। 'নূরুল কুরআন' পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পাপ থেকে বেঁচে থাকার ৩টি কারণ উপস্থাপন করেছেন। তা হলো ঃ (১) খোদা তা'লার ভয় (২) মালের আধিক্য যা অপকর্মের প্রধান মাধ্যম, এর কুফল থেকে বেঁচে থাকা (৩) দুর্বল ও বিনয়ী হয়ে জীবন যাপন করা যাতে শাসক হওয়ার স্পৃহা না জন্মে।"

আমাদের পাপ থেকে উন্নতি তখনই হবে যখন আমরা নফসে আম্মারাহ থেকে নফসে লাউয়ামায় উপনিত হব। অর্থাৎ আমরা মন্দ কর্মকে তিরস্কার করব। শুধু মন্দ কর্মকে তিরস্কার করলেই হল না এ থেকে মুখ ফিরিয়ে পুণ্যকে অর্জন করতে পারলেই আমরা মহান খোদার নিকট সম্মানিত হব। আমাদের মধ্যে কেউ কি কখনও জেনে শুনে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে চায়। কেউ কি জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, কেউ কি মৃত জ্ঞান করে সেই পথে যেতে চাইবে? সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ কখনো এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভাষায়, "কারণ তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো এই বিষ খেলে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। তবে কেন তোমরা সেই মৃত্যুর জন্য মোটেও চিন্তিত নও! যা খোদার আদেশ অমান্য করায় নিহিত?" অর্থাৎ সেই বিপদ সম্পর্কে, আগুন সম্পর্কে, সেই বিষ সম্পর্কে যতটা জ্ঞান রাখি সেই জ্ঞান আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মাত্রা-টুকুও রাখি না। কারণ তাঁর শাস্তি ও তাঁকে দুর্বল মনে করে নিয়েছি। আর সেই জাগতিক শক্তিকে অর্জন করাই আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আমরা কোন না কোন ভাবে পাপের ওপর নির্ভর করছি যার দরুণ আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নিপতিত হয়। **"ওয়া কুনু মা'সাদেকীন"**। (সূরা তওবা ঃ ১১৯) অর্থাৎ তোমরা যদি খোদার সাক্ষাত পেতে চাও, খোদার ভালোবাসা পেতে চাও, তাঁর নৈকট্য পেতে চাও, তাহলে চেষ্টা কর এবং সৎ ও সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করাও জরুরী। কারণ এর ব্যতিক্রমী ব্যবহারের মাধ্যমে কেউ কেউ অবনতির পথ বেছে নেয়।

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম এমন এক পরিপূর্ণ ধর্ম যা পাপ থেকে বেচে থাকবার উত্তম পথ প্রদর্শন করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যদি বাহ্যিক ক্ষতিরই চিন্তা করি তাহলেও এই ইসলামের শিক্ষা অবলম্বন করার মাধ্যমে পাপ পরিত্যাগ করে আমরা এই ক্ষতিকে রদ করতে পারব। এ ছাড়াও আধ্যাত্মিকভাবে পাপ হতে বাঁচতে হলে বেশি বেশি দোয়া করা জরুরী। মহানবী (সা.) প্রতিদিন একশত বার ইস্তেগফার পড়তেন। পাপ থেকে বেচে থাকতে তাক্‌ওয়াও প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন 'তাকওয়াই এই কথার নাম, সে যখন দেখে সে পাপে পড়িয়া যায় তখন সে দোয়া ও তদবীর (প্রচেষ্টা)-এর সহিত কাজ করে। নতুবা সে নির্বোধ হইবে। (মলফুযাত, ৫ম খন্ড, ২১৮)

আল্লাহ্ আমাদের অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন। যা ভালো পথে পরিচালিত করলে ভালো আর মন্দ পথে খরচ করলে পাপ। এতে সেই সত্তার কোন দোষ হবে না। যেমন ঃ বিদ্যুৎ অফিস থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দেয় তখন আগে থেকেই সতর্ক করা থাকে যে বিদ্যুতে কেউ হাত দিবেন না। দিলে বিপদের আশংকা আছে। কিন্তু যে ঐ বিদ্যুতে হাত দেয় সেটা তার বোকামি। তার এই ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী এতে সেই বিদ্যুৎ প্রবাহের কোন দোষ নেই।

তদ্রুপ, মহান আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত দেয়ার পরেও তা আমাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই বা ভুলে না যাই সে জন্য নিগরান হিসাবে প্রতি শতাব্দিতে মুজাদ্দেদ প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র আমাদের সতর্ক করার জন্য। পাপ থেকে বাচার জন্য আর তাঁর নির্দেশে জীবন যাপন করার জন্য। তার পরেও যদি আমরা তাকে না মানি তাহলে পাপটা আমাদেরই।

অর্থাৎ, আমাদের পূর্ণ মারেফত লাভ যা বলা হয় খোদা দর্শনেরই স্থলাভিষিক্ত একটি পর্যায়কে। এরই মাধ্যমে আমাদের মাধ্যমে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে, খোদা প্রেম সৃষ্টি হবে আর সেই ভালোবাসার আগুনে, সেই ভালোবাসার উজ্জ্বল আলোতে পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবেই আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে নফসে মুতমাইন্নায় উপনীত হতে পারবো। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে পাপ পরিত্যাগ করে পুণ্য অর্জনের রাস্তায় পাড়ি দেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন!

সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান, শাহেদ-২০১৫ ও জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একান্ত দয়ায় পরবশ হয়ে এবারের বাংলাদেশের সালানা জলসায় মোকাররম মওলানা সৈয়্যদ শামশাদ আহমদ সাহেব নাসের সাহেবকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হুযূর (আই.)- এর সম্মানিত প্রতিনিধিকে কেন্দ্র করে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শাহেদ ডিগ্রি অর্জনকারীদের সনদ বিতরণী প্রোগ্রাম গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর মোহতরম মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ জামেয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন।

তিনি বলেন, ২০০৬ ইং সনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ২০১৩ ইং সনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ হতে ৮ জন ছাত্র সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন। একইভাবে ২০১৪ সনে ৮ জন এবং ২০১৫ সনে ৮ জন ছাত্র সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে ২০১৫ সনে সম্মানিত ৮ জন শাহেদ ডিগ্রি অর্জন কারীদের শাহেদ ডিগ্রির সনদ প্রদান করা হবে। জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে সাত বৎসর মেয়াদী আন্তর্জাতিক জামেয়া আহমদীয়া অনুসরণে সিলেবাস পড়ানো হয়ে থাকে।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলঃ- ১. কুরআন করীমের তরজমা (উর্দূ ও বাংলায়), ২. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক তফসীর "তফসীরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)", ৩. হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক তফসীর "তফসীরে কবীর" ও "তফসীরে সগীর", ৪.ইলমে হাদীস, ৫.উর্দূ সাহিত্য, ৬.আরবী সাহিত্য, ৭. আরবি গ্রামার ও ইনশা, ৮. ফার্সি, ৯. ইংরেজী সাহিত্য, ১০.কালাম (বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে পরিচিতি ও সমাধান), ১১. মুয়াযেনা মাযাহেব (বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক পরিচিতি ও গবেষনামূলক চর্চা), ১২. ফিকাহ শাস্ত্র, ১৩. ইসলামের ইতিহাস এবং ১৪. আহমদীয়াতের ইতিহাস।

ছাত্রদের জামেয়ার পড়াশোনার পাশাপাশি মেধা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম নেয়া হয়। কুরআন তিলাওয়াত, নযম (বাংলা ও উর্দূ), রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (উর্দূ, বাংলা ও ইংরেজী), রুহানী খাযায়েন ও কুরআন কুইজসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রদের মানসিক ও শারিরিক সুস্থতার জন্য ইনডোর ও আউটডোর বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যাবস্থা রয়েছে। পড়াশোনার ও খেলাধূলার পাশাপাশি বৎসরে একবার পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবিছর ৪ দিন ব্যাপি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ শিক্ষা সফরে জামেয়ার দরজায়ে রাবেয়া (পঞ্চম ক্লাশ) ও দরজায়ে সালেসা (চতুর্থ ক্লাশ) এর ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে।

শেষ বৎসরের ছাত্ররা এক মাসের জন্য

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জন্মভূমি কাদিয়ান, দারুল আমান সফর করে থাকে। কাদিয়ান সফরের পাশাাশি কলকাতা, দিল্লী, শ্রী নগর,পৃথিবীর ভূসর্গ কাশ্মীর,শিমলা এবং ঈসা (আ.) এর কবর যিয়ারত করে থাকে। এছাড়া লুধিয়ানা, হুশিয়ারপুর, ডালহৌসি এবং বাবা ডেরা নানকও ভ্রমণ করে থাকে।

এছাড়া যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১১ টায় মোকাররম মওলানা সৈয়্যদ শামশাদ আহমদ নাসের সাহেব জামেয়া পরিদর্শন করেন। প্রথমে তিনি শিক্ষকমন্ডলীদেরকে অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ ও ভালাবাসার সাথে নসীহত করেন। এরপর জামেয়ার এসেম্বলী হলে যান এবং ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ ভাবে তিনি ছাত্রদের সামনে আনুগত্যের গুরুত্বের ওপর আলেকপাত করতে থাকেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা কিংবা খুতবা হতে উদ্ধৃতি প্রদান করেন। পরিশেষে ছাত্রদের পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

বার্ষিক নৈশভোজ ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

হুযূর (আই.)- এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা সৈয়্যদ শামশাদ আহমদ নাসের সাহেবের উপস্থিতিতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ বাদ এশা বার্ষিক নৈশভোজ ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জামেয়ার ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও এ ডিনারে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, গভর্নিং বোর্ডের সদস্যগণসহ ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যগণ এবং জামাতের বিভিন্ন দফতরের কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আই.)- এর সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেব ছাত্রদেরকে নসীহত প্রদান পূর্বক সংক্ষিপ্তভাবে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। কুরআন করীম তিলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল লাভকারী ছাত্র এবং বার্ষিক তালিমী ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেন।

সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি ৮ জন শাহেদদের মাঝে সনদ প্রদান করেন। এর পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর এবং হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। যারা এবার সনদ লাভ করেছেন তাঁরা হলেনঃ-

১. মওলানা হাজারী আহমদ আল্ মুনীম, ২. মওলানা সৈয়্যদ মুজাফফর আহমদ, ৩. মওলানা নাভিদুর রহমান, ৪. মওলানা আল্ হক, ৫ মওলানা জুনায়েদ ইসলাম, ৬. মওলানা মুহাম্মদ সালেহ, ৭. মওলানা জুবায়ের আহমদ, ৮. মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান।

মওলানা ইয়াছিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠাতে ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়–

pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

বরিশালে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

বরিশাল জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন ডা. মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বরিশাল। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ফাহিম আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবনের ওপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব ফাহিম আহমদ, সজিব তালুকদার, এ্যাড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম তালুকদার, মোহাম্মদ মোরশেদ আলম টিমু, বাহাউদ্দিন আহমদ এবং মওলানা নওশাদ আহমদ। সবশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি হয়।

নওশাদ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) উদযাপন করা হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, হাদীস, নযম পাঠের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাহীগঞ্জ-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০১/২০১৬ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ইশরাত জাহান। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন মোছাঃ নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সীরাত নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম, জিয়াসমিন আক্তার এবং মোছাঃ কবিতা পারভীন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। উপস্থিত মেহমানদের প্রশ্নোত্তর প্রদান করেন জনাব আব্দুল খালেক ও মৌ. আসলাম আহমদ। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ জিয়াসমিন আক্তার

বানিয়াজান জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০২/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ বানিয়াজান এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়।। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। জলসায় নবী করীম (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌ. আসাদুজ্জামান রাজীব ও মওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হয়। এতে মেহমানসহ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মৌ. আসাদুজ্জামান রাজীব

লাজনা ইমাইল্লাহ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৮/০১/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট লাকী আহমদ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন শাকিলা আনোয়ার। বক্তৃতা পর্বে রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন, বিনতে ইয়াছমিন, স্বপ্না মোস্তারী, নাসরিন জহুরা, আখি সেন্টু, শিউলি শুভ, নিলুফা ইয়াছমিন ও আমাতু। নযম পাঠ করে শোনান শতাব্দী আহমদ। পরিশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার ৩য় আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ৩য় আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাস পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নার্গিস ইসলাম ও ফারজানা শহীদ শিলা। উক্ত ক্লাসে ৪টি স্থান থেকে অর্থাৎ তেবাড়িয়া, কাফুরিয়া, বাগমারা ও মেরিগাছার লাজনা ও নাসেরাতরা অংশ গ্রহণ করেন। এতে প্রতিদিন প্রায় ৬০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসের বিষয়বস্তু ছিল শুদ্ধ কুরআন শেখানো, তরবিয়তী মূলক ক্লাস, নামায অর্থসহ, কাসীদা ও দোয়ার ক্লাস। ক্লাস শেষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং যারা ভাল ফলাফল করেছে তাদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এছাড়া পুরস্কারও দেওয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

লাকী আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে গত ০৫/০৩/২০১৬ তারিখ শনিবার সকাল ৯-৪৫ ঘটিকায় উদ্বোধনী অধিবেশন মোহতরম মোবশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদ কমপ্লেক্সে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আরম্ভ হয়। অধিবেশনের শুরুত পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। এরপর আরবি কাসিদা পরিবেশন করেন জনাব মনিবুর রহমান ও তার দল। অতঃপর উদ্বোধনী ও উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভার। বক্তৃতা পর্বে 'মানবতার প্রতি মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগ্রহ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। 'খাতামান নবীঈন (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব শেখ মুহাম্মদ ওমর। এরপর 'সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অতঃপর বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) সলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। এরপর 'ইসলামে ঐশী খেলাফত' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। অতঃপর 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল (সা.) প্রেম' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। এরপর 'মদীনা সনদের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অতঃপর সভার সভাপতি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব।

উক্ত জলসায় সর্বমোট ২১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। মেহমান ছিলেন পুরুষ ২৭ জন ও মহিলা ২৫ জন।

এন, এ শাহীন আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর (বাগ) এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অুষ্ঠিত

গত ৬ মার্চ রোজ রবিবার দুপুর ৩-৩০ মিনিটে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি। নযম পরিবেশন করেন জনাব জি, এম, সিরাজুল ইসলাম। বক্তৃতা পর্বে ন্যাশনাল আমীর বলেন, আজ সারা পৃথিবীতে সকল ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইসলাম এবং ইসলামের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র শিক্ষা জগতের মাঝে তুলে ধরেছে। ২০৮ টি দেশে আজ আহমদীয়া জামাত বিস্তৃত। আজ আমাদের দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে জানা এবং এ সম্পর্কে অন্যদেরকে জানানো। এছাড়া তিনি আরো বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম জঙ্গীবাদে সমর্থন করে না। আজ যারা এ পৃথিবীতে ইসলামের নামে জঙ্গী কার্যক্রম চালাচ্ছে তার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর 'মুহাম্মদ (সা.) এ দৃষ্টিতে একজন আদর্শ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) এর পবিত্র শিক্ষার আলোকে একজন আদর্শ মুসলমানের কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত তা উপস্থাপন করেন।

এরপর 'বিশ্ব শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তৃতার শুরুতে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৪নং আয়াতের শেষ অংশ তেলাওয়াত করেন এবং বলেন মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।

এরপর 'ইসলামের জন্য মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ইসলামের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের অতুলনীয় কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন।

দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়। তারপর প্রশ্নোত্তর সভা হয়। এতে আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নুরুল আমীন। উক্ত জলসায় ১৩০ জন আহমদী এবং ৭৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। ১ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক

বিভিন্ন জামাত ও সংগঠনগুলো যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করেছে, সংবাদ বিলম্বে পৌঁছার কারণে আমরা শুধু জামাত ও সংগঠনের নাম উল্লেখ করছি

খুলনা ২৬ ফেব্রুয়ারি। **বীরগঞ্জ** ২১ ফেব্রুয়ারি। **রাংটিয়া** ২৬ ফেব্রুয়ারি। **ভাতগাঁও** ২৬ ফেব্রুয়ারি। **হেলেঞ্চাকুড়ি** ২৬ ফেব্রুয়ারি। **ক্ষুদ্রপাড়া** ৪ মার্চ। **তাহেরাবাদ** ২৪ ফেব্রুয়ারি। **মাহিগঞ্জ** ২০ ফেব্রুয়ারি। **রঘুনাথপুর** ২০ ফেব্রুয়ারি। **বানিয়াজান** ২০ ফেব্রুয়ারি। **রঘুনাথপুর বাগের খেলার ডাঙ্গায়** ২৫ ফেব্রুয়ারি। **কেরালকাতা** ২৬ ফেব্রুয়ারি। **পটুয়াখালী** ২৬ ফেব্রুয়ারি। **লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফজিলপুর** ২৮ ফেব্রুয়ারি। **লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়ীয়া**র উদ্যোগে মল্লিক হাটিতে ১লা মার্চ। **নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্**র উদ্যোগে ৪ মার্চ। **মজলিস আনসারুল্লাহ্ তেজগাঁও** এর উদ্যোগে পালিত হয় ১৮ মার্চ। **মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা**র উদ্যোগে পালিত হয় ৯ মার্চ।

ডেস্ক রিপোর্ট

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৬/০২/২০১৬ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে আশকোনা মজলিসে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব জুলফিকার হায়দার, নায়েব যয়ীম আলা (আওয়াল) এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কারী মোহাম্মদ ফোজলুল হক এবং নযম পাঠ করেন জনাব জিকরে এলাহী। উক্ত অনুষ্ঠানে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনীর ওপর ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক বক্তব্য রাখেন জনাব শাহ মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর জনাব মাজেদুর রহমান ভুইয়া ও জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনীর ওপর মূল বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এতে ৪৮ জন পুরুষ ও ৪ জন জেরে তবলীগ এবং ২২ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে আশকোনা হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব তোফাজ্জল হোসেন দোয়া পরিচালনা করেন।

শফিকুল হাকীম আহমদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০/০২/২০১৬ রোজ শনিবার, বাদ মাগরেব বায়তুল আহাদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব নূরুদ্দীন আহমদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, মৌ, আবু তাহের, মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। দিবসটি তাৎপর্যের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল হাদী, ইউকে জামাত। সবশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ব ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

ক্রোড়ায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০/০২/২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরেব জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব এজাজ আহমদ ভুইয়া ও জনাব ছাবিক ছারোয়ার সুপ্রীম। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব মাহবুব রহমান জেপী, শরীফ আহমদ চৌধুরী, শরীফ আহমদ ভুইয়া এবং মৌ. আব্দুল হাকিম। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক (ইন্টু)

মজলিস আনসারুল্লাহ খুলনা রিজিওনাল কর্মশালা

গত ১১ মার্চ সকাল ৯:৩০ নায়েব সদর আউয়াল জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে খুলনা মসজিদে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে কর্মশালার আয়োজন ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সভাপতি। ৩৮তম মজলিস শূরার সুপারিশ বাস্তবায়নে মজলিসসমূহের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন খুলনা রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব আবদুর রাজ্জাক। মাসিক রিপোর্ট প্রণয়ন এবং যথারীতি প্রতিমাসে কেন্দ্রে রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব নঈম আলম খান। বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় কর্মশালা পুনরায় শুরু হয়। শুরুতে জনাব নঈম আলম খান মজলিসের অর্থ বিষয়ক সঠিক বাজেট প্রণয়ন, প্রতিমাসে চাঁদা আদায়, কেন্দ্রে প্রেরণ, অডিট করানো সকল নথিপত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলেচনা করেন। নায়েব সদর আউয়াল মোহাম্মদ আবদুল জলিল ২০১৬ সালের কর্ম ক্যালেন্ডারের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার পর কর্মশালা সমাপ্ত হয়। কর্মশালায় এ রিজিওনের ১২টি মজলিসের মধ্যে ৭টি মজলিস যথাক্রমে খুলনা, সুন্দরবন, যশোর, রগুনাথপুরবাগ, বলিয়ানপুর ও পাথরঘাটা থেকে মোট ১৯জন যোগদান করেন।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

মাহিগঞ্জে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ জানুয়ারী মাহিগঞ্জের হালকা দেওয়ানটুলিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে এক বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। সভার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এতে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। সভায় ৩৫ জন আহমদী এবং ৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াসমিন আক্তার

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

যুক্তরাজ্য জামাতের উদ্যোগে আয়োজিত ১৩তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৯ মার্চ, ২০১৬ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে গেল ১৩ তম শান্তি সম্মেলন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এই সম্মেলনে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন এবং আমন্ত্রিত অতিথি ও বিভিন্ন সংগঠন হতে আগত প্রতিনিধি বৃন্দেও উদ্দেশ্য একটি মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাউজ অব কমন্স এবং হাউজ অব লর্ডেও সদস্যবৃন্দ, ইউরোপিয়ান সংসদেও সদস্য সহ প্রায় সহস্রাধিক লোকেরও বেশি অতিথি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই বছর শান্তি সম্মেলনের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল **"ন্যায়বিচার-শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি"**।

অতিথি বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, Richmond Park ও North Kingston এর সংসদ সদস্য এবং লন্ডনের মেয়র পদে Conservative দলের প্রার্থী মিস্টার Zac Goldsmith; Mitcham এবং Morden এলাকার সংসদ সদস্য Siobain Mc Donagh, যিনি সংসদে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিনিধিত্ব-কারী; Beaconsfield এলাকার সংসদ সদস্য Rt Hon Dominic Grieve QC। এছাড়া Wimbledon এলাকার Lord জনাব তারেক আহমদ, যিনি Parliamentary Under Secretary of State for Transport Ges Countering Extremism বিষয়ক মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য Rt Hon Justine Greening।

বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগ সম্পর্কে আমন্ত্রিত প্রতিনিধিবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন। তারাহুযূর (আই.)-কে **"শান্তির দূত"** আখ্যা দেন।

এ সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল বক্তব্য। তিনি তাঁর বক্তৃতায়ম হানবী (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) জোড় দিয়ে বলেন, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম, যা কখনো সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্যের শিক্ষা দেয় না বরং সত্যিকার ইসলাম কখনো মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে না।

সম্মেলন শেষে হুযূর (আই.) বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেন। গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সংগঠন হতে আগত সাংবাদিকগণ এ সময় তাঁকে তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় চলমান সংকট সমাধানের বিষয়ে সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের দায়িত্ব কি এ সম্পর্কে হুযূর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারে হাতের কর্মদক্ষতা কমে

মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আপনার কর্মদক্ষতা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। সেই সাথে একটানা দীর্ঘ সময় মোবাইল ব্যবহার করলে আপনার হাতের ক্ষতিকর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাতের গঠনের পাশাপাশি আঙ্গুলে ব্যথা ও আঙ্গুল দিয়ে কোনো কিছু ধরার ক্ষমতা কমে আসে। এছাড়া এনলারজড মেডিয়ান নার্ভ নামের একটি বিশেষ সমস্যাও হয়।

সম্প্রতি তুরস্কের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। মাসল অ্যান্ড অনলাইন নামে একটি সাময়িকীতে গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়।

সুলাইমান ডামিরাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা জানান, অতিরিক্ত সেলফোন ব্যবহারের সঙ্গে সরাসরি ক্লিনিক্যাল কোনো যোগসূত্র আছে কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন বলে জানান তারা। তবে অতিরিক্ত ডিভাইস ব্যবহারে অবশ্যই ক্ষতি আছে।

গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর গবেষণা চালিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। সেলফোনের ব্যবহারে আসক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। অর্থাৎ সেলফোনে যার আসক্ত তাদের তাদের সঙ্গে অনাসক্তদের তুলনা করে প্রতিবেদন বানানো হয়। এতে অতিরিক্ত ব্যবহারে এফপিএল টেন্ডন বেড়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

(সূত্র: আমাদের সময়)

যেসব ফল খেলে ওজন কমে

শরীরের ওজন কমাতে কতজন কতকিছুই না করে থাকেন। শরীরের বাড়তি মেদ কমাতে কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়াই কমিয়ে দিয়েছেন। মেনে চলছেন অনেক বিধি-নিষেধ। তারপরও কমছে না ওজন। তবে প্রতিদিনের খাবার সম্পর্কে একটু সচেতন থাকলেই শরীরে বাড়তি মেদ জমবে না। দ্রুত শরীরের ওজন কমাতে ফলের বিকল্প নেই। নিচে ওজন কমাতে সহায়ক ৭টি ফল নিয়ে আলোচনা করা হলো :

আপেল: আপেলের পেকটিন ফাইবার পেট ভরানোর পাশাপাশি দেহে মেদের পরিমাণও কমাবে। ভারী খাবার খাওয়ার আগে আপেল খাওয়া তাই উপকারী।

তরমুজ: তরমুজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ওজন ঝরাতে সাহায্য করে। দিনে একটা তরমুজ খিদে কমিয়ে দেওয়ার সঙ্গে মেদ জমতেও দেবে না।

লেবু: লেবুতে আছে ভিটামিন সি ও সাইট্রিক অ্যাসিড। যা ওবেসিটির পরিমাণ কমায়।

নারকেল: নারকেল যকৃতের বিপাক হার বাড়িয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রকারান্তরে নিয়ন্ত্রণে থাকে ওজন।

বেদানা: বেদানা দেহে লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের হার কমায়। খিদের হার কমায়।

পেঁপে: পেঁপে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। রক্তে শর্করা ওবেসিটির লক্ষণ।

কমলালেবু: কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে পানি, ভিটামিন ও ফাইবার থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ফলে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(সূত্র : জি নিউজ)

কেন ভিটামিন এ খাওয়া জরুরি? ভিটামিন এ কেন গ্রহণ করবেন?

ভিটামিন এ সাধারণত রেটিনয়েডস এবং ক্যারটিনয়েডস নামে দুই ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত। এগুলো নিম্নরুপ:

রেটিনয়েডসএই যৌগটি চোখের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে কোষ, হাড়ের বৃদ্ধি এবং ইমিউন সিস্টেমের উন্নতি সাধন করে। সাধারণত কলিজা, ডিম এবং দুধে রেটিনয়েডস পাওয়া যায়।

ক্যারটিনয়েডসপাতা কপি, গাজর প্রভৃতি নানা ধরনের শাকসবজি এবং ফলমূলে সাধারণত ক্যারটিনয়েডস পাওয়া যায়। রেটিনয়েডসের মতো এটিও সুন্দর ত্বক এবং চোখের জন্য ভালো। আবার ইমিউন সিস্টেমকেও সাহায্য করে এটি।

ভিটামিন এ সমৃদ্ধ কিছু খাবার-বিভিন্ন ধরনের খাবারে ভিশেষ করে শাকসবজি এবং ফলমূলে সাধারণত ভিটামিন এ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মিষ্টি আলু, গরুর কলিজা, পালংশাক, গাজর, আম, পাতাকপি, ব্রোকলি প্রভৃতি অন্যতম।

ভিটামিন এ এর উপকারিতা- দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে হাড়ের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রজননে সাহায্য করে কোষের বিভাজন এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ইমিউন সিস্টেমের উন্নতি সাধন করে ত্বকের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করে

ভিটামিন এ এর অভাবে ক্ষতি-ভিটামির এ র অভাবে রাতকানা রোগ হতে পারে। এছাড়া এর অভাবে আঁশযুক্ত চামড়া, ভঙ্গুর চুল ও নখ এবং এদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয়, ভিটামিন এ এর অভাবে শরীরে লৌহের মাত্রা কমে যায়, ফলে পরবর্তীতে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তবে এ ভিটামিনের অভাবে সবচেয়ে বেশি ভোগেন বৃদ্ধরা।

সর্তকতাকোন ভিটামিনই বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা ঠিক নয়। অতিরিক্ত ভিটামিন এ গ্রহণের ফলে শরীরে নানা বিষাক্ত উপাদানের জন্ম হয়। যার কারণে মানুষের শরীরে নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, ত্বকে জ্বালা, জয়েন্টে ব্যথা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে অতিরিক্ত ভিটামিন এ গ্রহণে লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কাজেই ক্ষতি এড়াতে বেটা ক্যারটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎস থেকে পরিমিত ভিটামিন এ গ্রহণ করুন।

(সূত্র: হেলদি হলিস্টিক লিভিং)
সংগ্রহ ও উপস্থাপনা: সুমন মাহমুদ

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

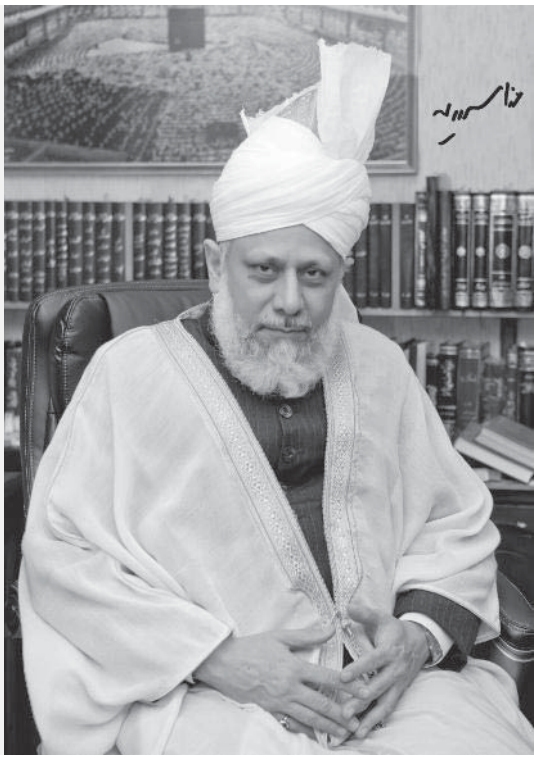

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 18 Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st March, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com